সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি

অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপন করা হলো

GIFT

382852

Dhaka University Library
382852

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রতিমা দাস
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৬৭/১৯৯৩-৯৪
নৃবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৯

M.Phil.

382852

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি

গবেষক
প্রতিমা দাস
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৬৭/১৯৯৩-৯৪
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382852

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী
অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

এই অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তু মৌলিক । এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ অন্য কোন ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয় নাই ।

প্রতিমা দাস ২২।১২।৯৯

প্রতিমা দাস
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ১৬৭/১৯৯৩-৯৪
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

আনোয়ার চৌধুরী

অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী
অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ ২২।১২।৯৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

382852

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার পাঁচ বৎসরের অধিক সময়ের পরিশ্রমের ফল । আমার এ কাজে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন । তাঁদের সকলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ।

প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী স্যারকে । যিনি সর্বকাজে আমাকে সঠিক পরামর্শ, দিক নির্দেশনা, উপদেশ এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মধ্যদিয়ে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন ।

আমার এম.ফিল. ১ম বর্ষের কোর্স শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর শাহেদ হাসান স্যারকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা তাঁর শিক্ষাদান, মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশের জন্য ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে শ্রীরতন কুমার দাস সহ অন্যান্য সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

আমার সহপাঠি মিসেস কামরুন্নাহার এবং মিঃ গোলাম হিলালীকে তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

যিনি বর্তমান গবেষণা কর্মসহ আমার সকল শিক্ষাগত ডিগ্রী অর্জনের অফুরন্ত অনুপ্রেরনার উৎস তিনি আমার স্বামী জয়ন্ত কুমার সেন যার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধানের শেষ নেই । সেই সাথে আমি আমার দুই সন্তানের (শুভজিত ও অভিজিত) কাছেও বিশেষভাবে ঋনী যারা আমাকে গবেষণা কর্মটি শেষ করতে প্রয়োজনীয় সময় দিয়েছে ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সকলের কাছে যাঁরা অসীম ধৈর্য ও মমতার সাথে আমাকে তাঁদের সংস্কৃতি অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছেন । বিশেষ করে প্রদীপ লানং এর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । যিনি আমাকে শত ব্যস্ততার মাঝেও তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমি (নৃগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে) যেখানে যেতে চেয়েছি সেখানেই নিয়ে গিয়েছেন ।

এছাড়া অন্যান্য সবাইকে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে অভিসন্দর্ভটি তৈরীতে কম্পিউটারে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনে মিঃ রেজাউল করিম সহ সকলের উদ্দেশ্যেই আমি অকুন্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

প্রতিমা দাস

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ	ভূমিকা	১ - ১৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর পটভূমি এবং গবেষণা এলাকার পরিচিতি	১৮ - ৩২
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	বস্তুগত সংস্কৃতি	৩৩ - ৪২
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	সামাজিক সংগঠন	৪৩ - ৬২
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	অর্থনৈতিক সংগঠন	৬৩ - ৮১
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	রাজনৈতিক সংগঠন	৮২ - ৮৭
সপ্তম অধ্যায় ঃ	ধর্মবিশ্বাস ও অতিপ্রাকৃত জগত	৮৮ - ৯৫
অষ্টম অধ্যায়ঃ	উপসংহার	৯৬ - ১০৩
	শব্দকোষ (GLOSSARY)	১০৪ - ১০৮
	গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থনির্দেশিকা	১০৯ - ১১৩
	আলোকচিত্র	১১৪ - ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র, সারনী ও তালিকা সূচী ঃ

		পৃষ্ঠা নং
মানচিত্র - ১ ঃ	বাংলাদেশ (সিলেট জেলাসহ)	২২ক
মানচিত্র - ২ ঃ	জৈন্তাপুর উপজেলা (গবেষণা এলাকাসহ)	৩২ক
সারনী - ১ ঃ	পুঞ্জিভিত্তিক জনসংখ্যা বিন্যাস	২৭
সারনী - ২ ঃ	খাসিয়া, হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মমতে অবস্থানকারীদের সংখ্যার বিন্যাস	২৮
সারনী - ৩ ঃ	শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিন্যাস	২৮
সারনী - ৪ ঃ	জৈন্তাপুর থানার জমির বিন্যাস	৩০
সারনী - ৫ ঃ	খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর পেশা বিন্যাস	৭৪
সারনী - ৬ ঃ	খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর আয়ের বিন্যাস	৭৫
সারনী - ৭ ঃ	খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর জমির বিন্যাস	৭৬
তালিকা - ১ ঃ	অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখা	২০
তালিকা - ২ ঃ	খাসিয়া রাজবংশ ও সময়কাল	২৪
তালিকা - ৩ ঃ	একটি খাসিয়া বাড়ি তৈরীর উপকরণ	৩৬
তালিকা - ৪ ঃ	খাসিয়াদের ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদির তালিকা	৪১
তালিকা - ৫ ঃ	খাসিয়াদের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও অন্যান্য দ্রব্যাদির তালিকা..	৪১
তালিকা - ৬ ঃ	খাসিয়া গোত্রের তালিকা	৪৮
তালিকা - ৭ ঃ	জ্ঞাতি সম্পর্কের তালিকা	৬০
তালিকা - ৮ ঃ	খাসিয়াদের দ্বারা উৎপাদিত কয়েকটি অর্থকরী ফসল ও সব্জির তালিকা	৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ক। **প্রস্তাবনা (Proposition) :** বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলায় যে সকল উল্লেখযোগ্য নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে এদের মধ্যে খাসিয়া এবং মনিপুরী নৃগোষ্ঠীই প্রধান। বর্তমান পৃথিবীতে মাতৃসূত্রীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে সকল নৃগোষ্ঠী বিদ্যমান রয়েছে খাসিয়া নৃগোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। ব্যাপক দারিদ্র ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাপে তাদের অধিকাংশ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলোই আজ বিলুপ্তির পথে। তথাপি খাসিয়া নৃগোষ্ঠী এ পর্যন্ত তাদের আদি সংস্কৃতির যেটুকু ধরে রাখতে পেরেছে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম।

খাসিয়া নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, জাফলং, তামাবিল এবং বৃহত্তর সিলেট জেলার কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল, সুনামগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই বসবাস করেছে। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা যা খাসি ভাষা নামে পরিচিত এবং এই ভাষা অস্ট্রো এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তারা একটি অতি প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ধারক। তাদের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বস্তুগত সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রাচীন বিশ্বাস ও আচার ভিত্তিক ধর্ম ব্যবস্থা। এ ধরনের বিরল একটি সমাজ ও সংস্কৃতির একটি পূর্ণচিত্র লাভের মধ্য দিয়ে মানব সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, যা নৃতাত্ত্বিক গবেষণার একটি অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে। এই প্রেক্ষিতেই সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির একটি এথনোগ্রাফি প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণা প্রস্তাবটি গ্রহন করা হয়।

খ। **গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী (Objectives of the Study) :** বর্তমান গবেষণার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরুপ ঃ

১) সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা।

Dhaka University Institutional Repository

২) তাদের নৃগোষ্ঠীগত পটভূমি, আবাসস্থল (অতীত ও বর্তমান), বস্তুগত সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংগঠন এবং আদি ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানা এবং এসব ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছে তা চিহ্নিত করা ।

৩) স্থানীয় এলাকার বৃহত্তর জনসাধারনের (বাঙ্গালী) সাথে তাদের সম্পর্ক নিরুপন করা ।

৪) সর্বোপরী সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি এথনোগ্রাফি (ethnography) প্রস্তুত করা ।

গ। **পরিধি ও গুরুত্ব (Scope and Importance) :** সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে নৃবিজ্ঞানে সমাজ ও সংস্কৃতির গবেষণা ও অধ্যয়নের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয় । আমাদের দেশে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা এখনও তার পরিনত বয়সে উন্নীত হয়নি । সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন ও গবেষণার মধ্য দিয়ে তার অন্তর্নিহিত নানা বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ , মানব সমাজের উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের নানা বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান ইত্যাদির মধ্য দিয়েই নৃবিজ্ঞানের গবেষণা এতকাল পরিচালিত হয়ে এসেছে ।

নৃবিজ্ঞানের গবেষণা তার পদ্ধতিগত কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কারনে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য যে কোন শাখার তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধান দিতে সক্ষম । ফলে নৃবিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ , সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যকার অন্তর্নিহিত চিত্রকে সঠিক ভাবে তুলে ধরা যায় ।

যে কারনে বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপের সমাজে যে কোন উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচী প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে এমনকি সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা ও সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী পরিচালনায়ও প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করা হচ্ছে । অগ্রসর কিংবা অনগ্রসর, সংকটে নিপতিত কিংবা সংকটমুক্ত যেকোন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই কোনো কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রাক-পরীক্ষন, পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্য কাজে লাগানোর প্রয়াস চলছে । এর অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

কারণ হচ্ছে একমাত্র নৃবিজ্ঞানীগনই সফলভাবে শ্রমনির্ভর, কষ্টসাধ্য উপায়ে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে তাদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের মাধ্যমে (দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন ও পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়ায়) তথ্য সংগ্রহ করেন, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও প্রথা সমপর্কে অবগত হন, যেমনটি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য শাখায় সম্ভব নয় ।

বাংলাদেশের মতো একটি পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও গতানুগতিক সমাজের উন্নয়নে নৃবিজ্ঞানকে অন্তত অনেককাল যাবত প্রায়োগিক বিজ্ঞান হিসাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন । নৃবিজ্ঞানের এই প্রায়োগিক গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশের একজন প্রথিকৃৎ নৃবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী মত প্রকাশ করেন যে, 'Anthropology must be applied anthropology in the context of Bangladesh for many years to come.' অর্থাৎ তাঁর মতে, 'তত্ত্বীয় জ্ঞান দানের পাশাপাশি ক্ষেত্র গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দৈহিক নানা দিক সম্পর্কে বাস্তবিক ও জীবন্ত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানের গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উন্নয়ন ও কল্যানমূলক প্রতিশ্রুতি জাগ্রত করতে হবে' । (চৌধুরী ও রশীদ , ১৯৯৫ঃ ১৬২) ।

এসকল গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনায় রেখেই বর্তমান গবেষনার জন্য বাংলাদেশের একটি অতিপ্রাচীন সংস্কৃতির ধারক খাসিয়া নৃগোষ্ঠীকে বেছে নেয়া হয়েছে । এপর্যন্ত খাসিয়া নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম বাংলাদেশে হয়নি । কাজেই বর্তমান গবেষণা তাদের ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি এথনোগ্রাফি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা হয়েছে ।

নৃবিজ্ঞানে এধরনের গবেষণার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে । কারন বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জনগনও এদেশের নাগরিক । কিন্তু নানা কারনে তারা অনেক সুযোগ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় । এছাড়া তাদের বসবাসের স্থান হিসাবেও দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাই প্রধান । সুতরাং তাদের জন্য কি ধরনের সরকারী নীতিমালা ও কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যও তাদের সমাজের প্রকৃত চিত্র দেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর জানা খুবই জরুরী । বর্তমান গবেষণা এ বিষয়ে কার্যকরী অবদান রাখবে বলে আশা করা যায় । এছাড়া দেশে কর্মরত বেসরকারী সংস্থাগুলো যারা জনগনের কল্যানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে তারাও এই গবেষণালব্ধ তথ্য, জেনে তাদের কর্মসূচী নিয়ে এ ধরনের নৃগোষ্ঠীগুলোর সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারবে ।

এসকল গুরুত্ব বিবেচনায় রেখেই বাংলাদেশের সিলেট জেলায় বসবাসরত খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণা কার্যটি পরিচালনা করা হয়েছে ।

ঘ। **পদ্ধতি (Methodology) :** বর্তমান গবেষণা সিলেট জেলার জৈন্তাপুর থানার নিজপাট এবং মোকামপুঞ্জি নামক দুটি গ্রামে নিবিড় প্রত্যক্ষানুসন্ধান (intensive fieldwork) পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় । নিবিড় প্রত্যক্ষানুসন্ধান (intensive fieldwork) নৃতাত্ত্বিক গবেষণারই অন্যতম পদ্ধতি । একই সাথে অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষন, ক্যামেরা, ডাইরী সংরক্ষন, অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার পদ্ধতিগুলো সহায়ক হিসাবে এই ক্ষেত্রে গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োগ করা হয় ।

গবেষণা গ্রামে যাবার পূর্বে খাসিয়া নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যাবলী প্রাসঙ্গিক বইপত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্যাদি গবেষণা কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে ।

১৯৯৮ সনের জানুয়ারী মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট দশ মাসে নিবিড় প্রত্যক্ষানুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োগে এই গবেষণা কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে । তবে এই গবেষণা কার্য চলাকালীন সময়ে দুইবার গবেষককে ঢাকা আসতে হয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাধীন দুটি গ্রামের ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি খাসিয়া পরিবারের সাথে গবেষকের মেশার সুযোগ ঘটেছে । প্রথম দিকে ভাষার কারনে গবেষণা কার্যে সামান্য বিঘ্ন ঘটে । পরবর্তীতে তাদের ভাষা কিছুটা আয়ত্বে এলে এ সমস্যা দূরীভূত হয় । এছাড়া তারা সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা বোঝে এবং বলতে পারে বিধায় অনেক সময় সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়ও তাদের সাথে কথোপকথন সম্ভব হয়েছে । তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহনের সুযোগ ঘটায় গবেষণার জন্য তা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে । গবেষণাকালের প্রথম মাসে গবেষক শুধুমাত্র তাদের সাথে গল্পগুজব এবং ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাদের কাছে গ্রহনযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন । কখনও তাদের সামনে তাদের সম্পর্কিত কোনো তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়নি । দিনশেষে গবেষক একান্তে সমস্ত তথ্যাদি ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করেন । এছাড়া একটি ছোট খানা গননার (house hold census) এর মাধ্যমে নৃগোষ্ঠীর কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়, গবেষণা সময়ের মাঝামাঝি সময়ে এটা করা হয়, যখন নৃগোষ্ঠীর সকলে গবেষকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা পোষন করতে শুরু করেছেন । গবেষণা গ্রামে (নিজপাট) খাসিয়া পাড়া থেকে সামান্য দূরবর্তী একটি হিন্দু পরিবারে গবেষকের থাকার সুযোগ ঘটে । এই পরিবারটি এলাকার দীর্ঘকালের স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাদের সাথে খাসিয়া কয়েকটি পরিবারের সামাজিক মেলামেশা থাকায় গবেষকের জন্য এই বাড়ীতে অবস্থান গবেষনাকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে ।

গবেষণাকালের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়েছে অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষনে (participant observation) । দুর্লভ মুহূর্ত গুলোকে ক্যামেরাবন্দী করার সুযোগ ঘটেছে এই গবেষণায় । এসবের মধ্য দিয়ে গবেষণার প্রয়োজনে খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর বস্তুগত, সংস্কৃতি , ভাষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংগঠন ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

৩। প্রাসঙ্গিক বইপত্র পর্যালোচনা

বাংলাদেশের খাসিয়া সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা কর্ম ও বই পত্রের সংখ্যা খুবই কম। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে যা কিছু রচিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি ।

১। প্রথমেই আব্দুস সাত্তার (১৯৭৫) রচিত The Tribal Culture in Bangladesh গ্রন্থের খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির কিছু উল্লেখযোগ্য দিক পর্যালোচনা করা হলো। আব্দুস সাত্তার খাসিয়াদের ধর্মকে 'animism' বা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। একে তিনি বলেছেন 'spirit worship'। তিনি উল্লেখ করেন যে, খাসিয়ারা যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা শুভ (good) এবং অশুভ (evil) উভয় শক্তিরই উপাসনা করেন। আব্দুস সাত্তার আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের খাসিয়ারা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে শক্তিমান বিধাতা এবং বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। খাসিয়ারা মনে করে যে, তারা যদি দেব দেবীদের পূজা এবং বলিদানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তবে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোন উদ্বেগ ও অশান্তি থাকবে না। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি প্রাকৃতিক ব্যাপার বা `Phenomenon' ই কোন না কোন শুভ বা অশুভ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই খাসিয়া ধর্মের সারবস্তুই হচ্ছে এই শুভ এবং অশুভ শক্তির উপাসনা। এই একই ধরনের উপাসনায় আফ্রিকার বান্টু এবং অষ্ট্রেলিয়ার *অরুন্তা* (*Auranta*) ট্রাইবরাও বিশ্বাস করে বলে সাত্তার উল্লেখ করেন। *প্রেতাত্মার* বিশ্বাসের সাথে সাথে খাসিয়ারা পুর্ব পুরুষের সন্তুষ্টি বিধানে ও উপাসনা করে থাকে।

এর কারণ হিসাবে আব্দুস সাত্তার উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন বিষয়ে ভীতি এজাতীয় ধর্ম বিশ্বাসীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতির ভীতি, শষ্যহানীর আশংকা, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়, নিঃসংগ গুহা অথবা অরণ্যে বন্য জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়, রোগ ও মহামারীর ভীতি, তাদের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সব নানাবিধ ভয়-ভীতির কারণেই তারা বিভিন্ন শক্তি ও পূর্ব পুরুষের আত্মাকে নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করে । এই একই বিষয়ে আবদুস সাত্তার আরও বলেন, খাসিয়ারা বিশ্বাস করে যে, যদি মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন না হয় তবে তার আবার পুর্নজন্ম হবে পোকা মাকড় বা নিকৃষ্ট জন্তু হিসাবে । আর যদি সঠিকভাবে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় তবে মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভ হবে । খাসিয়ারা তাদের প্রত্যেক উপাসনা কর্মেই মোরগ বা ছাগল অথবা শুকর উৎসর্গ করে থাকে । এ কারনে গৃহপালিত মোরগ তাদের কাছে খুবই পবিত্র বলে বিবেচিত হয় । এছাড়া এই গ্রন্থে খাসিয়াদের ডিম ভাংগা অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হয় যা তাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ভবিষ্যতের কর্মপন্থা তারা এই ডিম ভাংগা অনুষ্ঠানটির মধ্যে দিয়েই নির্ধারণ করে। আবদুস সাত্তার অন্নুবাচী উৎসবটি খাসিয়াদের জাতীয় উৎসব বলে উল্লেখ করেন । এছাড়া কোন রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে খাসিয়ারা *থেলেন* বা অজগর সাপের পূজা করে । তবে এর সাথে হিন্দুদের মনসাপুজার কোন মিল নেই বলে উল্লেখ করা হয় । এ ভাবে আবদুস সাত্তার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস এবং বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেন তাঁর The Tribal Culture in Bangladesh গ্রন্থটিতে ।

২। The Khasis

পি, আর, টি, গর্ডন (১৯০৭) রচিত The Khasis গ্রন্থটি খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবন ধারা বর্ননায় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয় । এযাবতকালে যত লেখকই খাসিয়াদের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। গর্ডন খাসিয়াদের আবাস ভূমি হিসেবে খাসিয়া জৈন্তিয়া পাবর্ত্য এলাকার কথা উল্লেখ করেন । খাসিয়াদের শারীরিক গঠনের বর্ণণা দিতে গিয়ে গর্ডন লিখেছেন যে, এদের গায়ের রং হলুদাভ বাদামী, নাসিকা অনুচ্চ এবং ললাট প্রশস্ত হয়ে থাকে । খাসিয়া নারী পুরুষ উভয়ে স্বাস্থ্যবান এবং সুগঠিত দেহের অধিকারী হয়ে থাকে । খাসিয়াদের উদ্ভব (origin) সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না তবে

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এদেরকে তিনি "Mon-Mhmer" গোষ্ঠীভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথার দিক দিয়ে খাসিয়াদের সাথে কম্বোডিয়ার জনগোষ্ঠীর বেশ কিছু মিল রয়েছে বলে গর্ডন লিখেছেন। খাসিয়াদের প্রধান অর্থকরী ফসল রুপে ধান, আলু, কমলা, পান-সুপারী এবং খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড়ে আনারস, হলুদ, আদা, কুমড়া, মরিচ এবং একধরনের ছোট ইক্ষু চাষের কথা গর্ডনের বইটিতে রয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন যে, কমলার সাথে সাথে লেবুও খাসিয়ারা উৎপাদন করে এবং তেজপাতা তাদের অন্যতম রপ্তানি কারক ফসল। দক্ষিন-পূর্ব জৈন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের চাষাবাদের প্রধান পদ্ধতিই "*জুম*" (jhum) চাষ বলে গর্ডন উল্লেখ করেছেন। খাসিয়ারা এক বিশেষ পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন করে থাকে বলে গর্ডন তার গ্রন্থে বর্ননা দেন। একসময় খাসিয়ারা লৌহ গলানো শিল্পের সাথে যুক্ত ছিল তবে যখন তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন ততদিনে এই শিল্প লোপ পেতে শুরু করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। খাসিয়ারা পরিপাটি পোষাক পরিচ্ছদে থাকতে পছন্দ করে এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাদের প্রিয় গহনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া মাছ ধরা ও শিকার করা তাদের প্রিয় শখ। ডিম খাসিয়াদের নিকট ভবিষ্যৎবানী করার জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় পার্থিব উপকরন। তাদের ডিম ভেঙ্গে ভবিষ্যতবানী করার এক বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে এবং তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বে ডিম ভেঙ্গে এর শুভ বা অশুভ ফল নির্ধারন করে থাকে বলে গর্ডন উল্লেখ করেছেন। খাসিয়ারা পরিমিত পরিমানে মদ্যপান করে থাকে এবং এই মদ ভাত থেকে তৈরী হয়ে থাকে বলে জানা যায়। খাসিয়াদের পরিবার মাতৃপ্রধান এবং পরিবারে ছোট মেয়েই সম্পত্তির সিংহভাগ লাভ করে। খাসিয়া বিবাহ সম্পর্কে গর্ডন লিখেছেন যে, খাসিয়ারা নিজেদের গোত্রে বিয়ে করেনা এবং বিবাহের পর স্বামী তার স্ত্রীর মায়ের বাড়ীতে (matrilocal residence) বসবাস করে। তাদের ধর্ম হচ্ছে সর্ব-প্রাণবাদ (animism) বা "spirit worship"। তারা নানা রকমের শক্তির উপাসনা করে মাত্র। তবে খাসিয়ারা কখনও মুর্তি বা প্রতীক নির্মান করে উপাসনা করে না। কোন বিশেষ শক্তির উদ্দেশ্যে *বলী* উৎসর্গ করাই খাসিয়াদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রধান দিক রুপে মেজর গর্ডন ব্যাখ্যা করেন। উদাহারণ হিসেবে গর্ডন লিখেছেন, '*উ-লেই মুলক*' (*U'Lei Muluk*) হচ্ছে `God of state'। এর কাছে তারা বৎসরে

Dhaka University Institutional Repository

একবার একটা ছাগল বা একটা মোরগ উৎসর্গ করে। *'কা-তারো'*(*ka taroh*) হচ্ছে এক অশুভ শক্তি যা খাসিয়াদের একধরনের জ্বর বিকার জনিত রোগের জন্য দায়ী। একসময় খাসিয়াদের মধ্যে *'থেলেন'* নামক বিরাট সাপের নিকট মানুষ উৎসর্গ করার প্রথা ছিল । একে তিনি *থেলেন* উপাসনা (thlen supersitition) নামে বর্ণনা দিয়েছেন। খাসিয়ারা পৃথক পৃথক গ্রামে বসবাস করতো। এই এলাকা গুলোকে গর্ডন `state' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি `state' প্রধান রূপে একজন `siem' থাকতো এবং এরাই খাসিয়াদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরূপে বিবেচিত হতো বলে গর্ডন লিখেছেন। প্রত্যেক সিয়েমদের নিজস্ব দরবার থাকতো এবং এই দরবারের পরামর্শ ও সম্মতি ক্রমেই *সিয়েমরা* বিচার কার্যসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করতেন। এভাবে খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক জীবনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিকের বর্ণনা গর্ডন তাঁর **The Khasis** গ্রন্থে দক্ষতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন ।

৩। **Tribal Life of North-Eastern India(1986)** : এস. টি. দাস রচিত উপরোক্ত গ্রন্থে উত্তর-পূর্ব ভারতের কতিপয় নৃগোষ্ঠীর জীবনের বেশ কিছু দিক সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গারো, লুসাই, জেমি-নাগা, কুকি, মনিপুরি ও খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর বসতি, অর্থনীতি, প্রথা ও ঐতিহ্যের তুলনামূলক আলোচনা । এই নৃগোষ্ঠীগুলোর আবাসস্থল হিসাবে এস.টি দাস, মনিপুরি, ত্রিপুরা , গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড় এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর কথা উল্লেখ করেন।

এদের মধ্যে খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সম্পর্কে এস.টি.দাস বলেন যে, খাসিয়ারা ইন্দো-চীন অঞ্চল হতে আগত *'মন-খেমার'* পরিবারভূক্ত এবং *'মন-খেমার'* ভাষাগোষ্ঠীর লোকদল। এদের দৈহিক গঠনের বর্ণনা দিতে গিয়ে এস. টি. দাস লিখেছেন যে, খাসিয়ারা বাদামী গাত্রবর্ণ, আকৃতিতে ছোটি খাটো গড়নের এবং সুগঠিত পায়ের গোড়ালীর অধিকারী বলে সহজেই অনেক ওজন বহন করতে পারে। তারা হাসিখুশী স্বভাবের, সঙ্গীত ও কৌতুক প্রিয়, বাইরের জীবনকে ভালবাসার সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের সাথে খুবই আন্তরিক হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এস. টি. দাস আরও উল্লেখ করেন যে, গারোদের মত খাসিয়াদের সমাজ ব্যবস্থাও মাতৃসুত্রীয়। এক্ষেত্রে খাসিয়া মেয়েরা মায়ের নিকট হতে উত্তরাধিকার সুত্রে সম্পত্তি পেয়ে থাকে। খাসিয়া পুরুষেরা বিবাহের পরে স্ত্রীর মাতৃগৃহে বসবাস করে বলে এই গ্রন্থটিতে উল্লেখ রয়েছে। এস. টি দাস উল্লেখিত খাসিয়াদের ব্যবহৃত যে সকল অস্ত্র রয়েছে সেগুলোর মধ্যে দা, তলোয়ার, বর্শা, তীর-ধনুকই প্রধান। তারা কামানে ব্যবহৃত গান পাউডার সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তারা যে তলোয়ার ব্যবহার করতো সেগুলো ছিল খুবই ভারী। তবে এসবের মধ্যে তীর-ধনুকই খাসিয়াদের ব্যবহৃত প্রিয় অস্ত্র।

তিনি খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত এক প্রাচীন *মনুষ্য বলীর* (human sacrifices) কথা লিখেছেন। এটা প্রধানত **'খাসিয়া-জৈন্তিয়া'** পাহাড়ে বসবাসরত খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, এই প্রথা খাসিয়ারা সমতলের তান্ত্রিক হিন্দুদের নিকট থেকে শিখেছে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের খাসিয়া নৃগোষ্ঠী প্রধানকে বলা হত *'সিয়েম'* (siem) অথবা *'দলই'* (*doloi*) অথাবা *রাজা* (*raja*)। এরা প্রজাদের নিকট থেকে প্রধান হিসেবই সম্মানিত হতেন তবে প্রশাসনিক বিষয়াদির সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে এই প্রধান নির্ভরশীল ছিলেন তাঁর মন্ত্রীদের উপর। তাই এস. টি. দাসের মতে, যদিও এই খাসিয়া প্রধান বা *সিয়েম* রা উত্তরাধিকার সূত্রেই এই পদ লাভ করতেন তথাপিও তাদের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল গনতান্ত্রিক। একারনেই বৃটিশ প্রশাসন যারা কিনা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছিল তারাও এধরনের পার্বত্য প্রশাসনিক বাবস্থায় হস্তক্ষেপ করতোনা বলে এস.টি. দাস মত প্রকাশ করেন।

৪। **Descriptive Ethnology of Bengal (1978)** : ই.টি.ডালটন রচিত এই গ্রন্থটিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তরাংশের বেশ কিছু পার্বত্য নৃগোষ্ঠীর জীবনের তুলনামূলক বর্ণনা রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের `Jyntias and Kasias' এই শিরোনামে তিনি খাসিয়া নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করেছেন। ডালটনের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আসামের কপিলি নদী পার হয়ে যে জনগোষ্ঠীর দেখা পাওয়া যায় তারাই খাসিয়া নৃগোষ্ঠী।

Dhaka University Institutional Repository

সমতলের লোকেরা তাদের খাসিয়া বলেই অভিহিত করে থাকে তবে 'খাসি হিল্‌সের' বাসিন্দারা নিজেদের *খাই (khy)* বলে পরিচয় দেয়। ডালটন উল্লেখ করেন, খাসিয়ারা সুদর্শন, পেশীবহুল স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কর্মঠ। তারা পথ চলার সময় তীর-ধনুক এবং একটি উন্মুক্ত তরবারী ও ঢাল বহন করে যা কখনও কখনও তাদের বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করে।

খাসিয়া রাজত্বের উত্তরাধিকার সম্পর্কে ডালটন বলেন, খাসিয়া রাজত্বের উত্তরাধিকারী ছিল রাজার বোনের ছেলে। বোন রাজকুমারী হিসাবে অভিহিত হতেন এবং তাঁর বিয়ে হতো কোন সম্ভ্রান্ত খাসিয়া পরিবারে। এভাবে বাইরের কোন নৃগোষ্ঠীতে তাদের বিয়ে হতো না বলে তাদের রক্তে তেমন কোন মিশ্রন ঘটেনি। ডালটন লিখেছেন যে, খাসিয়া রাজা বৃটিশ সরকার দ্বারাই ক্ষমতাচ্যুত হন ; তবে তিনি সভ্য এবং প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

ডালটন বলেন যে, খাসিয়ারা তাদের সুগঠিত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী এক উল্লেখযোগ্য নৃগোষ্ঠী। উজ্জল গাত্রবর্ণ, খোশ-মেজাজ সম্পন্ন যুবা বয়সের খাসিয়ারা প্রানবন্ত ও আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করে। ডালটন তাদের সৎচরিত্র এবং প্রভূভক্ত বলে বর্ণনা করেন। তবে তারা কোন ক্ষুদ্র শিল্পজাত পন্য উৎপাদনের ব্যাপারে অক্ষম। উদাহরণ স্বরুপ তারা যে পোশাক পরিধান করে তা ডালটনের ভাষায় অদ্ভুত ধরনের (**peculiar style**) এর এবং তাও তাদের জন্য অন্য ট্রাইবের লোকেরা তৈরী করে থাকে।

ডালটন খাসিয়াদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে লিখেছেন যে, তারা ভাত, জোয়ার, ভুট্টা, কচু এবং বিভিন্ন মূল জাতীয় খাদ্য খায়। এছাড়া তারা কাছাকাছি পাওয়া যায় এমন সব ধরনের মাংস এবং শুক্‌না মাছ খেয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া ধর্ম সম্পর্কে ডালটন বর্ণনা করেছেন যে, তারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে কিন্তু অধিক গ্রুরুত্ব দিয়ে থাকে নানা ধরনের প্রেতাত্মার উপর যারা কিনা পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করে বলে তারা বিশ্বাস করেন। খাসিয়াদের অতি প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত কোন মন্দির বা মুর্তি নেই বলে ডালটনের রচনা থেকে জানা যায়।

৫। MEGHALAYA : Trumph of the Tribal Genius (1970) ঃ

কমলেশ্বর সিন্‌হা রচিত এই গ্রন্থটিতে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের অধিবাসিদের আর্থ-সামাজিক ও বিশেষ করে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। মেঘালয় রাজ্যটি ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ। যদিও মাত্র ৮,৭০৬ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এটি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য তথাপি ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও কৌশলগত কারণে এটি ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। মেঘালয় রাজ্যটি খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড় এবং অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল দ্বারা পূর্ণ। এর মধ্যে খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে বসবাসরত নাগরিকরাই খাসিয়া নামে পরিচিত। সিন্‌হা উল্লেখ করেন যে, **'খাসি হিলস্'** বা খাসিয়া পাহাড় ৫০ জন রাজা বা ***'সিয়েম'*** দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আকারে শাসিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলেও এরা স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করতো। সিন্‌হা আরও উল্লেখ করেন যে, এই *রাজা* বা *'সিয়েম'* বা *সর্দার* এরা নির্বাচিত হতো বিশেষ কোন পরিবার থেকে এবং উত্তরাধিকার নির্ধারিত হতো মাতৃধারায়। সিন্‌হা খাসিয়াদের পারিবারিক উত্তরাধিকারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারি। সে যে বাড়িতে থাকে সে বাড়িতেই পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে। তাই সিন্‌হা উল্লেখ করেন যে, খাসিয়া সমাজে নারীদের রয়েছে অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন স্থান। নারীরাই সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকার লাভ করে। সন্তান-সন্ততি মায়ের পরিচয়ে বড় হয় এবং মায়ের গোত্রই তাদের গোত্র।

Dhaka University Institutional Repository

সিন্‌হার বর্ণনামতে, খাসিয়াদের সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি গনতান্ত্রিক। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখান যে, একটা খাসিয়া গ্রামে একটি গ্রাম্য দরবার থাকে যার দলনেতা হলেন সেই গ্রামের হেডম্যান এবং সমস্ত বয়স্ক লোকেরা এই দরবারে অংশ নিয়ে থাকেন। এই দরবার, স্কুল-ভবন নির্মান, রাস্তা-ঘাটের রক্ষনাবেক্ষন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন, ইত্যাদি ব্যবস্থার তদারকি সহ বিভিন্ন গ্রাম্য বিরোধ মিমাংশা করে থাকে। এভাবে সিন্‌হা আরও বর্ণনা দেন যে, অনেকগুলো গ্রাম আবার একত্রিত হয়ে একটি কমিউন **(commune)** গঠন করে। এই বিশেষ কমিউন **(commune)** দরবার সাধারণতঃ একজন নির্বাচিত প্রধান বা পুরোহিতের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সকল বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিরা সেখানে অংশগ্রহন করে।

এই কমিউন দরবার একগ্রামের সাথে অন্য গ্রামের সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ, ভূমি এবং বনাঞ্চলকে অবৈধ দখল থেকে রক্ষা ইত্যাদি করার চেষ্টা করে। আবার অনেকগুলো কমিউন মিলে একটি রাজ্য গঠিত হয় এবং এই রাজ্যের প্রশাসক হলেন একজন প্রধান যিনি *'সিয়েম'* নামে অভিহিত হতেন এবং যাকে সাহায্য করে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত **মন্ত্রীবর্গ**। এই খাসিয়া প্রধান তার **মন্ত্রী পরিষদ** নিয়ে সকল প্রশাসনিক কার্য এবং বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং এভাবে নিজস্ব এলাকার উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। সিন্‌হার মতে খাসিয়া প্রধান একাধারে একটি পদ এবং একটি প্রতিষ্ঠান ও বটে যা খাসিয়া সম্প্রদায়ের মতই প্রাচীন যা স্মরনাতীত কাল থেকেই খাসিয়াদের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে আসছে। প্রাক-ব্রিটিশ শাসনামলে মোট ৩০ জন খাসিয়া প্রধান বা *সিয়েম* (siem) ছিলেন বলে সিন্‌হা উল্লেখ করেন।

৬। **The Aboriginal Tribes of India (1974)** : Stephen Fuch রচিত এই গ্রন্থটিতে উত্তর, মধ্য, পূর্ব এবং দক্ষিন ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে বসবাসরত কতিপয় নৃগোষ্ঠীর সমাজ জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির একটি অধ্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থকার খাসিয়া নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকার উল্লেখ করেন যে, পূর্ব-ভারতের মেঘালয় রাজ্যে খাসিয়া এবং এই নৃগোষ্ঠীর কিছু শাখা যেমন সিনতেং, উয়ার, লিংগ্যাম এবং আরো কয়েকটি উপজাতির বসবাস রয়েছে। ১৯৬১ সালে এদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,১৪,১৬১ জন। Fuch এর মতে, ভাষাগত দিক থেকে এরা অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা *'মন-খেমার'* শাখাভূক্ত। গ্রন্থকার আরও উল্লেখ করেন যে, খাসিয়াদের ভাষার সাথে ভারতের মুন্ডা নৃগোষ্ঠীর ভাষার বেশ মিল রয়েছে এবং সংস্কৃতির দিক থেকেও খাসিয়া ও মুন্ডাদের মিল রয়েছে।

গ্রন্থকার এর বর্ণনামতে, খাসিয়ারা মূলতঃ জুম চাষ করে ফসল উৎপাদন করে। জুম চাষ করে তারা ধান, মেইজ, ভূট্টা, আলু এসব উৎপাদন করে থাকে। Fuch এর গ্রন্থটিতে খাসিয়া সমাজের মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। তারা নিজেদের গোত্রে বিয়ে করেনা। তারা মনে করে যে সকল খাসিয়া একই পূর্ব সূরী হতে উদ্ভুত। তাদের গোত্রগুলির মর্যাদা অনুযায়ী কয়েকটি উপ-গোত্রে বিভক্ত। এগুলো যথাক্রমে রাজকীয় (royal), পুরোহিত শ্রেনী (priestly) অথবা সাধারণ শ্রেনী (commoner's ranks) থেকে খাসিয়া প্রধান নির্বাচিত হন এই 'royal class' বা রাজকীয় গোত্র থেকে। এই খাসিয়া প্রধান সম্পর্কে গ্রন্থকার উল্লেখ করেন যে, তিনি জমি অথবা বনসম্পদের উপর ক্ষমতাবান ছিলেন না। এই প্রধান প্রজাদের উপর কোন কর আরোপ করতে পারতেন না এবং তার দরবারের সম্মতি ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণ করতে পারতেন না। এরকম একটি দরবার সকলের জন্য খোলা ছিল আর রাজ্যের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা এই দরবারে আসত যা কিনা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল বলে গ্রন্থকার মত প্রকাশ করেন।

খাসিয়াদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে গ্রন্থকারের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং *উ-ব্লাই নং থাউ (U-Bly Nongthaou)* হচ্ছে তাদের ঈশ্বর।

Dhaka University Institutional Repository

৭. **CASTE TRIBES AND CULTURE OF INDIA : ASSAM (1977)** : কে. পি বাহাদুর রচিত উল্লেখিত গ্রন্থটিতে ভারতের আসামে বসবাসরত কতিপয় নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। এদের মধ্যে আছে নাগা, খাসিয়া, গারো, মিকির, কাচারি, সাঁওতাল এবং মেইথেইদের জীবনচিত্রের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। সাধারণভাবে গ্রন্থকার এসব নৃগোষ্ঠী জীবনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন এবং এগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন, যেমন ঃ ১। উৎপত্তির ইতিহাস এবং বসতি (origin and habitat); ২। সাধারণ পরিচিতি (general appearance): দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য (physical and mental traits); ৩। গার্হস্থ্য জীবন (domestic life); ৪। ধর্ম (religion); ৫। অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস এবং লোকাচার (superstion and folklore)। খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, আসামের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পার্বত্য এলাকার প্রায় ৬,১৫৭ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। খাসিয়াদের একটি শাখা বা অংশকে *সিনতেং (Synteng)* বা *পনার (Pnar)* ও বলা হয়। এদের একটি অংশ খাসিয়া পার্বত্য এলাকায় এবং *সিনতেং* বা *পনার* অংশটি জৈন্তিয়া পার্বত্য এলাকায় বসবাস করে। গ্রন্থকার আরো উল্লেখ করেন যে, খাসিয়ারা বাদামী গাত্রবর্ণ, ছোটখাট ও পেশীবহুল দেহসৌষ্ঠব এবং অত্যন্ত সুগঠিত পায়ের অধিকারী হয়ে থাকে। তারা উৎফুল্ল মেজাজ, সংগীত ও কৌতুক প্রিয়, এবং তারা পরিশ্রমী নৃগোষ্ঠী বলে বাহাদুর উল্লেখ করেন। খাসিয়াদের উৎপত্তির ইতিহাস (origin) সম্পর্কে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। অনেক বক্তব্যের সাথে এটাও ধারনা করা হয় যে, তারা বার্মা থেকে পাতকোই গিরিপথ বেয়ে ভারতের আসামে এসেছে এবং তারা পূর্ব ভারতের মন-আনাম (mon-anam) পরিবারেরই বংশধর। গ্রন্থকার খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত কিছু প্রথার সাথে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর কিছু প্রথাগত মিল দেখিয়েছেন, যেমন নাগাদের সাথে খাসিয়াদের সর্প দানব (serpent demon) এর উপাসনার মিল রয়েছে। বাহাদুরের বর্ণনা থেকে জানা যায় খাসিয়াদের অধিকাংশই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। তাদের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে- ধান, আলু, যব, ভূট্টা, হলুদ, আদা ও ইক্ষু।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়াদের ঘরবসতির বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাদের বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ঘরের ছাদ খুবই নীচু এবং ঘরের একপার্শ্বে মাত্র একটি জানালা থাকে। শিকার এবং মাছ ধরা খাসিয়াদের অন্যতম শখ হিসাবে বাহাদুর উল্লেখ করেন। তিনি আরো আলোচনা করেন যে, খাসিয়ারা সর্বশক্তিমান ইশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও তারা জীবজন্তু উৎসর্গের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করে থাকে।

৮। এই পৃথিবীর মানুষ (১৯৮৯) ঃ এ.কে.এম. আমিনুল ইসলাম রচিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে। এই নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা না থাকলেও ইসলাম এই গ্রন্থখানিতে খাসিয়াদের ভাষা ও এর প্রভাব সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। ইসলামের বর্ণনামতে ভাষাতাত্বিক বিচারে খাসী ভাষা টিবেটো বার্মান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত নয়, এটা অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। বাংলাদেশের সিলেটের উত্তরে ভারতের মেঘালয় অঞ্চলের পূর্ব দিককার অর্ধেক এলাকা জুড়ে এ ভাষা ব্যপৃত। ভারতীয় আদমশুমারী অনুযায়ী ১৯৬১ সনে এদের জনসংখ্যা ছিল ৩,৬৪,০০০ অর্থাৎ তিন লক্ষ চৌষট্টি হাজার। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ইসলামের বর্ণনানুযায়ী তদানিন্তন ভারতবর্ষের আসাম প্রদেশের সিলেট জেলায় মোট খাসিয়ার সংখ্যা ছিল তিন হাজার। বাংলার সমভূমির অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক আদান প্রদান ছিল আর তাদের অনেকেই পানের (betel leaf) ব্যবসা করে বাংলার মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে বলে ইসলাম উল্লেখ করেন।

তিনি খাসিয়াদের সম্পর্কে আরও যে সকল তথ্যাদি উপস্থাপন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে খাসিয়াদের বাসস্থানকে *পুঞ্জী* হিসেবে উল্লেখ করা। সামাজিক আচার আচরনে এরা মাতৃসূত্রীয় (matrilineal) এবং এবং মাতার মৃত্যুর পর সর্বকনিষ্ঠা মেয়ে উত্তরাধিকার লাভ করে। এদের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী, অবশিষ্ট নিজস্ব পুরাতন খাসিয়া ধর্মের অনুসারী। বিভাগ পূর্বকাল থেকেই খাসিয়ারা তাদের নিজস্ব ভাষার স্কুল তৈরী করেছে এবং এদিক থেকে বিচার করে ইসলামের মতে খাসিয়াদের ঠিক উপজাতীয় পর্যায়ে ফেলা যায় না। ঐক্যবদ্ধতার দিক থেকে এদের একটা স্বতন্ত্র জাতীয় মর্যাদার

Dhaka University Institutional Repository

দাবীদার বলে মেনে নিতে হয়। এদের একটি উপভাষা রয়েছে *(পনার)* যা সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে প্রচলিত। এই ভাষায় যারা কথা বলে তাদেরকে অনেকে জয়ন্তিয়া বলেও অভিহিত করে। এই *পনার* ভাষাভাষী লোকেরা পরবর্তীতে বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে বলে ইসলামের রচনা থেকে জানা যায়।

পর্যালোচনাকৃত গ্রন্থসমূহের বেশ কিছু বর্ননার সাথে বর্তমান গবেষণাধীন খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মিল রয়েছে। প্রথমতঃ জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ সিলেট জেলার খাসিয়ারাও করে থাকে। দ্বিতীয়ত ঃ গ্রন্থগুলোতে খাসিয়াদের ধর্মবিশ্বাসের যে বর্ননা রয়েছে তার সাথে বর্তমান খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মিল রয়েছে। তৃতীয়ত ঃ পর্যালোচনাকৃত গ্রন্থসমূহের বর্ননানুযায়ী খাসিয়া ভাষা *মনখেমার* ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। গবেষণালব্ধ তথ্য হতেও এই একই তথ্য পাওয়া যায়। খাসিয়াদের সমাজব্যাবস্থা মাতৃসূত্রীয়, এ সংক্রান্ত আলোচনাগুলোর সাথে বাংলাদেশের মাতৃসূত্রীয় খাসিয়া সমাজ ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। তবে পর্যালোচনাকৃত গ্রন্থসমূহের বর্ননামত অনেক প্রথাই আজ আর খাসিয়াদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। যথা ঃ

প্রথমত ঃ গর্ডন (১৯০৭) এর বর্ননানুযায়ী খাসিয়াদের মধ্যে যে *থেলেন* নামক সাপের উদ্দেশ্যে মানুষ হত্যা'র প্রথা ছিল, তা বর্তমান সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশের খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী প্রধান বা নেতাকে *মন্ত্রী* হিসাবে অভিহিত করা হয় *সিয়েম* রুপে নয়।

সিন্‌হার বর্ননায় গ্রাম সংগঠন হিসাবে যে কমিউন দরবার ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে সিলেট জেলার খাসিয়াদের গ্রাম প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তবে এই গ্রামগুলো একত্রে মিলিতভাবে কোন রাজত্ব সৃষ্টি করে না। বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রাম গুলোর মত খাসিয়াদের পুঞ্জিগুলো এক একটি গ্রাম রুপেই বিবেচিত হয়ে থাকে। পর্যালোচনাকৃত গ্রন্থগুলোর সাথে গবেষণালব্ধ তথ্যাদির আলোচিত মিল এবং গরমিল সমুহই লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর পটভূমি এবং গবেষণা এলাকার পরিচিতি

পটভূমি ঃ পৃথিবীতে যে সকল নৃগোষ্ঠী তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের আদিরুপ নিয়ে আজ অবধি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে খাসিয়া নৃগোষ্ঠী তাদের অন্যতম । সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষের সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়েছে । কোথাও এর পরিবর্তন হয়েছে দ্রুত, কোথাও ধীরে । আজকের এই সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে সংহত রুপ লাভ করেছে । মানুষের প্রাচীন প্রথাও প্রতিষ্ঠান গুলো আজ অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় বিলুপ্ত । এর কারণ অনেক । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও এর প্রয়োগ, কলাকৌশলগত পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সহ আরও অসংখ্য কারণ মানুষের সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে । ঠিক এরকম একটা অবস্থায় ও খাসিয়া নৃগোষ্ঠী তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলোকে মোটামুটি অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছে । যদিও পরিবর্তনের ছোঁয়া তাদের জীবনেও লেগেছে, তথাপি আধুনিক পৃথিবীর ব্যাপক পরিবর্তনের তুলনায় তা সামান্যই বলা চলে ।

খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর প্রারম্ভিক ইতিহাস সম্পর্কিত কোনরুপ লিখিত তথ্যাদি না থাকায় এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কোনোরুপ মন্তব্য করা যায় না। তাই তাদের জীবন যাত্রার সঠিক পূর্বচিত্র খুঁজে পাবার জন্য ফিরে যেতে হয় তাদের লোকগাঁথা (legend), পৌরানিক কাহিনী (myth), লোকাচার (folk-lore) এবং প্রথা-প্রতিষ্ঠান(customs) ইত্যাদির কাছে ।

খাসিয়াদের দেহের গড়ন ও মুখাকৃতির সাথে চীনা ও বার্মিজদের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় । এদের গাত্র বর্ণ উজ্জ্বল বা ফর্সা, নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট এবং পায়ের গোড়ালী মোটা । দেহের উচ্চতা মাঝারী ধরনের । হাত, পা, পেশী বহুল এবং পায়ের নিচের অংশ সুগঠিত ও ভারি হবার কারনে এরা পাহাড় বেয়ে অনেক ওজন বহন করে

Dhaka University Institutional Repository

চলাফেরা করতে পারে। তাদের চুলের রং ও চোখের মনি সাধারনত কালো রং এর হয়ে থাকে। এসব বিচারে অনেকেই তাদেরকে আদি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ সম্পর্কে জে. এন. চৌধুরী যে মতামত দিয়েছেন তা প্রনিধানযোগ্য -

"The khasis are not merely an extention of proto Australoid Mundaric races to the further east of Indian sub-continent, but from ethnic, linguistic and cultural point of veiw, they have closer and more immediate link with the Wa's and the Palaungs and other linguistic and ethnic groups in Burma, Indo-China, Laos, Siam (Thailand) etc, once included within the orbit of what was known as further India, now more appropriately as south-East Asia Nevertheless, the remote relationship of the khasis with the proto-Australoid races of India is an established fact, and many common cultural traits survive the vicissitudes of racial movements back and forth, as will be seen presently. The forefather of the khasis, who were a branch of Mon-Annam family, as has been noticed above, having been detached from the main body by a wedge of the Tibeto-Burman people pressing upon them, entered the confines of India, and pursued a westward migration until they were finally established in their present home." (J.N. Chowdhury, 1996: 65,66)

খাসিয়াদের সংস্কৃতির যে বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি তাদের মধ্যে সজীব, অপরিবর্তিত এবং প্রানবন্ত ভাবে বিদ্যমান রয়েছে তা হচ্ছে তাদের ভাষা। ইতিপূর্বে তাই বহু ভাষাবিদ খাসিয়াদের ভাষা বিশ্লেষন করে তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খাসি ভাষা ঃ "ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে খাসি ভাষা টিবেটো-বার্মান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত নয়। এটা অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।" (ইসলাম, ১৯৮৯ঃ ১৬৮)। বাংলাদেশের সিলেটের উত্তরে, ভারতের মেঘালয় অঞ্চলের পূর্বদিককার অর্ধেক এলাকা জুড়ে এ ভাষা ব্যাপৃত। ভারতীয় আদমশুমারী অনুযায়ী ১৯৬১ সনে এদের জনসংখ্যা ছিল ৩,৬৪,০০০ (তিন লক্ষ চৌষট্টি হাজার)। অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষাকে অস্ট্রিক বা *মন-খেমার* নামেও অভিহিত করা হয়।

এই অস্ট্রিক ভাষা একদা সমগ্র উত্তর এবং মধ্য ভারতে প্রচলিত ছিল। বাংলাভাষার অধিকাংশ দেশী শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে নেয়া হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। খড়, খুঁটি, ঝিঙ্গা, চিঙ্গরী, ঢেঁকি, ডিঙ্গ, ঢিল, ঢিপি ইত্যাদি শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে। 'বঙ্গ নামটিও হয়তো এই সূত্রেই এসেছিল। সংস্কৃতেরও কোন কোন বিশিষ্ট শব্দ অষ্ট্রিক থেকে আগত। যেমন- নারিকেল, তাম্বুল, কদলী, গুবাক, অলাবু ইত্যাদি।' (সেন, ১৯৮৭ঃ ১৩৭, ১৩৮)।

অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার পরস্পর সম্বন্ধ নীচের ছকে দ্রষ্টব্য ঃ

তালিকা - ১

অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখা

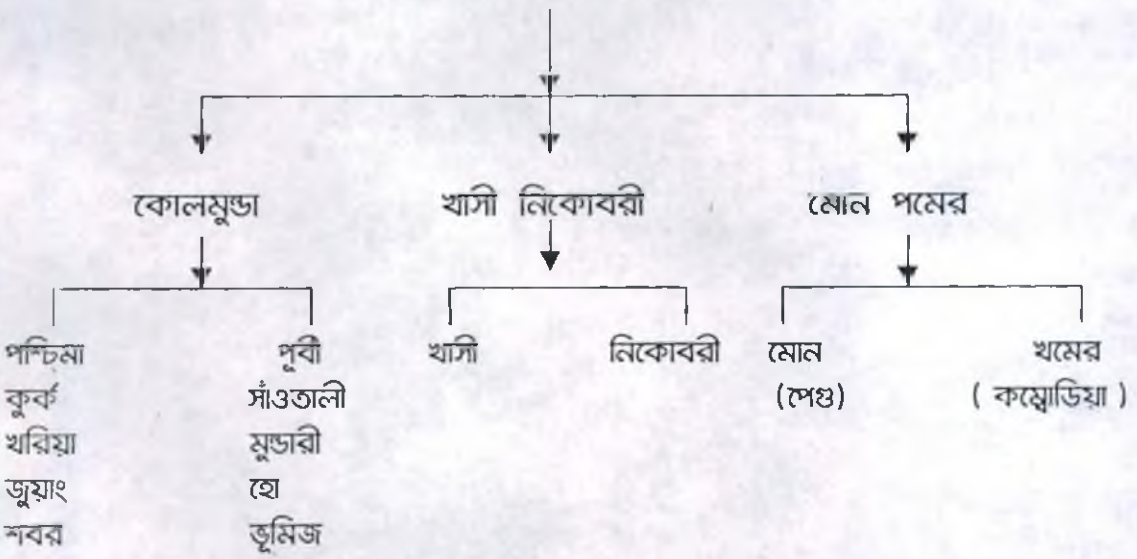

উৎস ঃ সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৮৭, পৃঃ ১৩৭, ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মদেশের পালাউং (Palaung) এবং মোন (Mon) ভাষার সাথে খাসিয়া ভাষার মিল বা সামঞ্জস্য যথেষ্ট । এছাড়াও কম্বোডিয়া (Combodia) আর ভিয়েতনামের (Vietnum) পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা এমনকি ভারত মহাসাগরের নিকোবর দীপপুঞ্জের (Nicoborese) ভাষার সাথে ও খাসিয়া ভাষার মিল প্রচুর । খাসিয়া ভাষার সাথে মধ্য পূর্ব ভারতের মুন্ডা (Munda) ভাষার ও এক আত্মিক যোগ রয়েছে এবং এদিক থেকে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষার সাথে মুন্ডা ভাষার এক যোগ সূত্র বা সেতুবন্ধন তৈরী করেছে খাসিয়া ভাষা। খাসিয়া ভাষার লিখিত বর্ণমালা নেই, কথ্যরুপই প্রচলিত । অতএব তাদেরকে অনক্ষর সমাজ (non-literate society) বলা যেতে পারে। তবে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বর্তমানে তারা লেখাপড়া করছে ।

মূল আবাসভূমি ঃ খাসিয়া নৃগোষ্ঠী ভারতের মেঘালয় ও বাংলাদেশের সিলেট জেলার কিছু কিছু পাহাড়ী এলাকায় বহু শতাব্দী ধরে বসবাস করছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আসামের মূখ্য কমিশনারের আমলে বর্তমান মেঘালয় কে 'ইউনাইটেড খাসি ও জৈন্তিয়া হিলস'' নামে একটা জেলার নাম দেয়া হয় সেখানে মূলত খাসিয়ারাই বসবাস করতো । 'জৈন্তিয়া হিল্স ' শিলং মালভূমিরই পরিবর্তিত রুপ যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত । এর দক্ষিনে রয়েছে বাংলাদেশের সমভূমি আর উত্তর পূর্বে ভারতের আসাম । উত্তরে রয়েছে 'খাসি হিলস' যা ক্রমান্বয়ে নীচু হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সাথে মিশেছে । আর দক্ষিনদিকে রাজ্যটি মিশে আছে বাংলাদেশের সুরমা উপত্যকার সাথে । এই পার্বত্য এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে Barkataki বলেন, "The remarkable plateau of the Garo-Khasi- North Cachar Hills is joined its eastern extremely by the Patkoi Range to the Himalayam system and by the hills of Manipur to the Arakan Yoma of Burma," (Barkataki, 1969:29) । একারনেই সম্ভবত ধারনা করা হয় যে, খাসিয়ারা বহুপ্রাচীন সময়কালে এই পাতকোই গিরিপথ বেয়েই আসামে এসে বসতি স্থাপন করে ।

Dhaka University Institutional Repository

তাই ভারতের খাসিয়া এবং জৈন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল খাসিয়াদের আদি বাসস্থান হলেও কোনো সুদুর অতীতে বহিরাগত হিসাবেই তারা সেখানে আগমন করেছিল । কিভাবে এবং কোথা থেকে তারা এ অঞ্চলে আসে সে সম্পর্কিত কোনরুপ তথ্য প্রমানাদি না থাকায় নিশ্চিত করে এ ব্যপারে কিছু বলা যায় না। তবে ঐতিহাসিক তথ্য, প্রাচীন মুদ্রা এবং তাম্রফলাকাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ অঞ্চলে তাদের আগমন সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যায় ।

খাসিয়াদের ভাষা বিশ্লেষন করে ডঃ গ্রীয়ারসন উল্লেখ করেছেন যে, এরা চীন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী । চীনের হোয়াই কং ও ইয়াং সিকিয়াং নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এরা বসবাস করতো । কালক্রমে উক্ত নদীপথ বেয়ে তারা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । কিন্তু রেভারেন্ড এইচ. রবার্টস্ ও স্যাডওয়েল প্রমুখের মতে, "এরা মূলতঃ ব্রহ্মদেশের অধিবাসী ছিল ; সেখান থেকে পাতকোই গিরিপথ বেয়ে আস্তে আস্তে আসামে এসে বসতি স্থাপন করে । তাঁদের মন্তব্যকে জোরালো করার জন্য তারা উল্লেখ করেন যে, খাসিয়ারা দীর্ঘদিন যাবত প্রতিবছর একটি করে কুঠার[১] আনুগত্যের নিদর্শনস্বরুপ উপহার পাঠাতো ।" (Gurdon, 1907 : 2)

এ সম্পর্কে আরো একটি মতামত হলো - " Ethnologically, the khasis are different from the other hill tribes of Assam. While the later are supposed to have migrated from the south-east. Their Mon-Khemer speech is still spoken in combodia and pegu and anthropologist have noticed some common customs and habits among the Khasis and Malayasians."(S.T. Das, 1986: 45)

এভাবে উপমহাদেশে এদের আগমনের পূর্বকথা তেমন নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও তাদের আদি বাসস্থান হিসাবে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পার্বত্য এলাকার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ।

---

১. বাংলাদেশের সিলেট জেলার খাসিয়াদের মধ্যে এই রীতির প্রচলন নাই ।

Dhaka University Institutional Repository

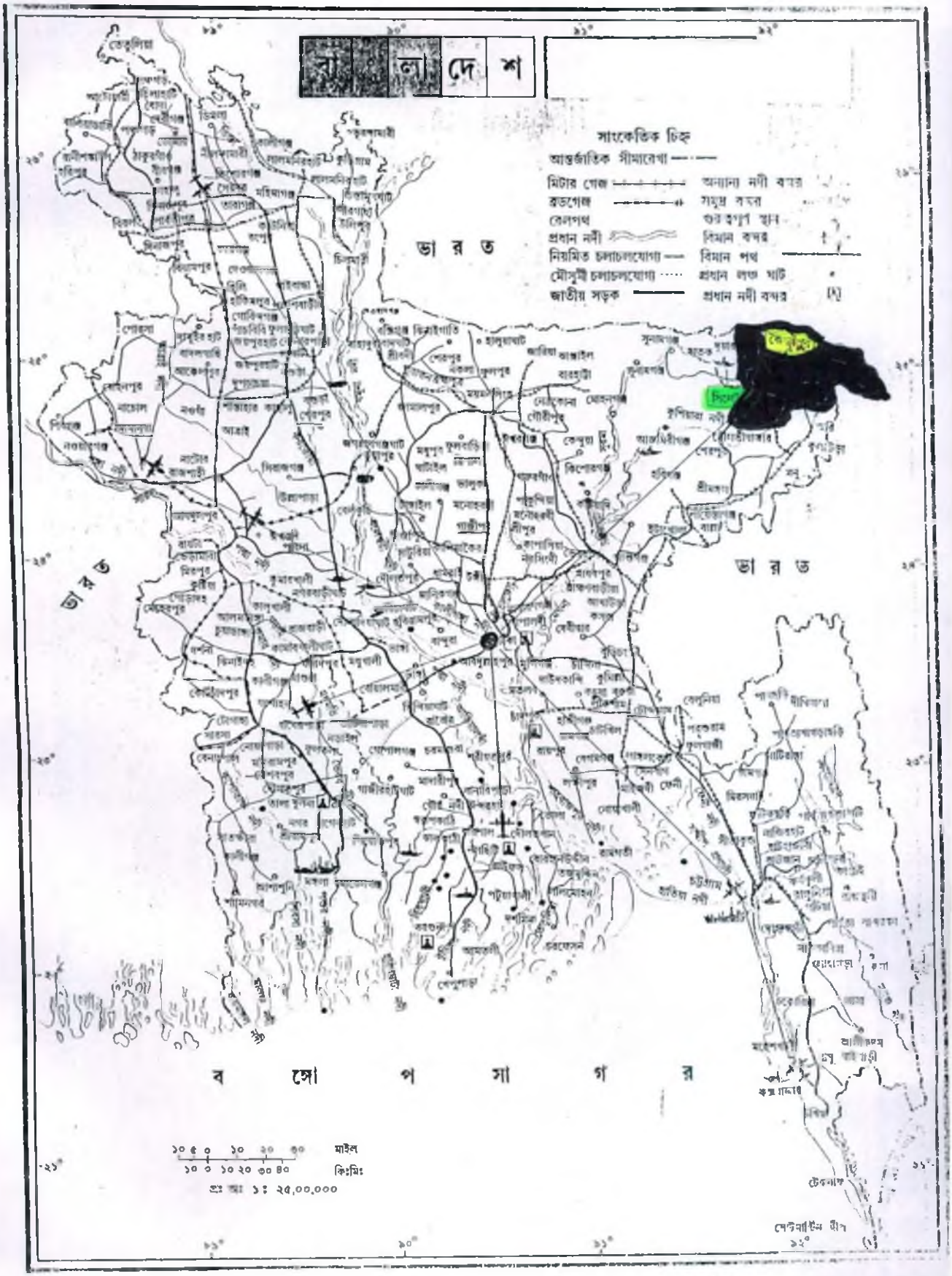

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বসতি স্থাপনের প্রথম সময়কাল ও স্থান ঃ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খাসিয়ারা 'জৈন্তিয়া' পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সিলেট জেলার জয়ন্তীয়াপুর (জৈন্তাপুর) নামক স্থানেই বসতি স্থাপন করে। এই জৈন্তিয়া (যা বর্তমানে জৈন্তাপুর থানা নামে পরিচিত) বাংলাদেশের সিলেট জেলার উত্তর-পূর্বকোণে অবস্থিত। এই স্থানেই এককালে খাসিয়াদের একটি রাজত্ব গড়ে উঠেছিল। " The Khasi Hills from the western portion of the district and the Jaintia Hills the eastern. The Khasis inhabit the Khasi Hills proper, and the Syntengs or Pnars, the Jaintia Hills. the Later hills take their name from the Rajas of Jaintia, the former rulers of this part of country, who had as their capital Jaintiapur, a place situated at the foot of the Jaintia Hills on the southern side, which now falls within the boundaries of sylhet district" (Gurdon, 1907: 1)

বর্তমানে "এই খাসিয়াদের কিয়দাংশ বাস রয়েছে খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়ের দক্ষিন পূর্বাঞ্চলে এবং সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, জাফলং, তামাবিল অঞ্চল, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, বড়লেখা এবং সুনামগঞ্জ জেলার কিছু পাহাড় ঘেরা অঞ্চলে। ঐতিহাসিকদের মতানুসারে এই খাসিয়ারা পাঁচশত বছরের বেশী আগে বাংলাদেশে আসে।" (অনিল কিষণ সিংহ, ১৯৯৪, ১৭০)।

সুতরাং বাংলাদেশে খাসিয়াদের প্রথম বসতি স্থাপনের সময়কাল হিসাবে পাঁচশত বছরের অধিক পূর্বেকার সময়কে ধরা যায় এবং স্থান হিসাবে সিলেট জেলার জৈন্তাপুর নামক স্থানটিকে চিহ্নিত করা যায় । জৈন্তা বা জয়ন্তিয়া অতি প্রাচীন জনপদ। বহুপূর্ব থেকেই এই প্রাচীন জনপদ জৈন্তারাজ্য নামেই অভিহিত হতো। সুদূর অতীতকালে অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

এই রাজ্য হিন্দু রাজাগন দ্বারাই শাসিত হতো। গেইট রচিত (Gait. E.A) আসামের ইতিহাসে ব্রাহ্মন পুরোহিত বংশের শেষ চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন ঃ

১। কেদারেশ্বর রায়

২। ধনেশ্বর রায়

৩। কন্দর্প রায়

৪। জয়ন্ত রায়।

পরবর্তীতে এই পার্বত্য খাসিয়াদের দ্বারাই হিন্দু রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। তবে ১৭শ শতাব্দীর পূর্বেকার ইতিহাস তমাসাচ্ছন্ন। কারণ এ সম্পর্কিত কোন লিখিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয় নাই। গেইট রচিত আসামের ইতিহাসে যে শেষ চারজন রাজার নাম পাওয়া যায় এদের শেষ রাজা জয়ন্ত রায়ের কন্যা জয়ন্তীর সাথে *হতুঙ্গ পুঞ্জির* খাসিয়া সর্দার পুত্র লন্ডবরের বিয়ে হয় এবং এভাবে খাসিয়া রাজবংশের গোড়াপত্তন ঘটে। খাসিয়া রাজাগন প্রথমে পর্বত থেকেই রাজত্ব পরিচালনা করতেন। ১৬৮০ সনে রাজা লক্ষী নারায়ণের সময় পর্বত পরিত্যাগ করে সমতলের জৈন্তার নিজপাটে রাজধানী স্থাপিত হয়। তবে পাহাড়ের *নর্তিয়াং পুঞ্জী* দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে বিবেচিত হতো। সিংহের প্রতিমুর্তি জৈন্তার রাজকীয় প্রতীকরুপে ব্যবহৃত হতো।

মোট তেইশজন খাসিয়া রাজা জৈন্তায় রাজত্ব করেন। তাদের নাম ও সময়কাল নিম্নরুপ ঃ

তালিকা - ২

খাসিয়া রাজবংশ ও সময়কাল

ক্রমিক নং	রাজাদের নাম	সময়কাল
১।	মহারাজ পর্ব্বত রায়	১৫০০ - ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ
২।	" মাঝ গোসাঞি	১৫১৬-১৫৩২ "

Dhaka University Institutional Repository

৩।	মহারাজ বুড়া পর্বত রায়	১৫৩২-১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দ
৪।	" বড় গোসাঞি (১ম)	১৫৪৮-১৫৬৪ "
৫।	" বিজয় মানিক	১৫৬৪-১৫৮০ "
৬।	" প্রতাপ রায়	১৫৮০-১৫৯৬ "
৭।	" ধন মানিক	১৫৯৬-১৬০৬ "
৮।	" যশো মানিক	১৬০৬-১৬২৫ "
৯।	" সুন্দর রায়	১৬২৫-১৬৩৬ "
১০।	" ছোট পর্বত রায়	১৬৩৬-১৬৪৮ "
১১।	" যশোমন্ত রায়	১৬৬৮-১৬৬৮ "
১২।	" বানসিংহ	১৬৬-১৬৬৯ "
১৩।	" প্রতাপ সিংহ	১৬৬৯-১৬৭০ "
১৪।	" লক্ষী নারায়ণ	১৬৭০-১৭০১ "
১৫।	" রামসিংহ (১ম)	১৭০১-১৭০৮ "
১৬।	" জয় নারায়ণ	১৭০৮-১৭৩১ "
১৭।	" বড় গোসাঞি (২য়)	১৭৩১-১৭৭০ "
১৮।	" ছত্র সিংহ	১৭৭০-১৭৭৪ "
১৯।	" যাত্রা নারায়ণ	১৭৭৪-১৭৮২ "
২০।	" বিজয় সিংহ	১৭৮২-১৭৮৮ "
২১।	" লক্ষী সিংহ	১৭৮৮-১৭৯০ "
২২।	" রাম সিংহ (২য়)	১৭৯০-১৮৩২ "
২৩।	" রাজেন্দ্র সিংহ (ইন্দ্র সিংহ)	১৮৩২-১৮৩৫ "

রাজা রাজেন্দ্র সিংহ বা ইন্দ্র সিংহই জৈন্তার শেষ স্বাধীন খাসিয়া রাজা। অতঃপর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্র বৃটিশ শাসনাধীন করা হয়। এভাবে জৈন্তায় খাসিয়া রাজবংশের শাসন বিলুপ্ত হয়। তবে বৃটিশ রাজত্বের বেশ কিছুকাল সময় পর্যন্ত খাসিয়া রাজা সম্মানিত হতেন যদিও তার প্রভুত সহায় সম্পদ বৃটিশরা করায়ত্ব করে নেয়। জৈন্তার শেষ রাজার উত্তরাধিকারী রাজকুমারী ইরা দেবী'র (যার স্বামী জন্মেজয় বর্মন, যিনি বৃটিশ ভারতে সিলেটের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন) নামানুসারে জৈন্তাপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে যে জৈন্তাশ্বরী কালীবাড়ি ছিল তা 'রাজকুমারী ইরা দেবী মিলনায়তন' নামে সংরক্ষিত রয়েছে। এর পাশেই তোয়াশিহাটি ও উজানিনগর নামের পাশাপাশি দুটি স্থানে বেশ কিছু খাসিয়া পরিবার বর্তমানে বসবাস করছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বর্তমানে জৈন্তাপুর থানার মোকাম পুঞ্জি এবং গোয়াইন ঘাট থানার জাফলং এলাকার নকসিয়া পুঞ্জি, সংগ্রাম পুঞ্জি, বল্লাপুঞ্জি ও লামাপুঞ্জি নামক গ্রামে খাসিয়ারা বসবাস করছে । বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মৌলভিবাজার, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, বড়লেখা এবং সুনামগঞ্জ জেলার কিছু অঞ্চলে বর্তমানে খাসিয়ারা বসবাস করছে ।

গবেষণা এলাকার পরিচিতি ঃ বর্তমান গবেষণার জন্য সিলেট জেলার জৈন্তাপুর থানার নিজপাট গ্রামের একটি অংশে তোয়াশিহাটী ও উজানীনগর (একসাথে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি খাসিয়া পাড়া) এবং মোকাম পুঞ্জি নামক অপর ১টি খাসিয়া গ্রাম, মোট দুটি উল্লেখযোগ্য খাসিয়া বসতি এলাকা নির্বাচন করা হয় ।

গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য জৈন্তাপুর থানার এই দুটি গ্রাম নির্বাচিত করার অন্যতম কারণ হলো ভারতের ' খাসিয়া জৈন্তিয়া' পর্বতে বসবাসরত খাসিয়া নৃগোষ্ঠী সুদূর অতীতে এই জৈন্তাপুর থানার নিজপাটে তাদের রাজধানী স্থাপন করে এই অঞ্চলে খাসিয়া রাজত্ব বিস্তার করেছিল । রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর বেশ কিছু খাসিয়া পরিবার বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলে বসবাস করছে । তাদের মূল আবাসভূমি- 'খাসিয়া জৈন্তিয়া' পাহাড় এই অঞ্চল থেকে মাত্র ১২ কিঃ মিটার দূরত্বে অবস্থিত । বাংলাদেশের তামাবিল সীমান্তের পরবর্তী অংশেই "খাসিয়া জৈন্তিয়া" পার্বত্য এলাকার সীমানা শুরু হয়ে যায় । জৈন্তাপুর থানার খাসিয়াদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বেশকিছু অতীত স্মৃতি চিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে । এর মধ্যে জৈন্তাপুরের নিজপাটে খাসিয়া রাজবাড়ির (যদিও কোন ধ্বংসাবশেষ নেই) স্থানটি চিহ্নিত করা আছে । এখানে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । এছাড়া বহুপূর্বে খাসিয়ারা যে প্রস্তর উত্তোলন রীতিতে অভ্যস্ত ছিল তারই নিদর্শন স্বরুপ দু'একটি স্থানে বিশাল কয়েকটি প্রস্তর খন্ড (গোলাকৃতি ও লম্বাকৃতির) অদ্যাবধি দন্ডায়মান রয়েছে । যদিও এসব স্মৃতি চিহ্ন যথার্থ সংরক্ষনের অভাবে জরাজীর্ণ দশায় উপনীত হয়েছে । তথাপি এসব নিদর্শন খাসিয়াদের গৌরবময় সুদুর অতীতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় ।

Dhaka University Institutional Repository

এসব প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অতিতের উত্তরসূরী খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর যে ক্ষুদ্র অংশ জৈন্তাপুর থানায় বর্তমানে বসবাস করছে এরকম দুটি গ্রামকেই বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে । নিম্নে গবেষণাধীন গ্রামের পুঞ্জি ভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাস দেখানো হলো ঃ

সারনী - ১

পুঞ্জিভিত্তিক জনসংখ্যা বিন্যাস

পুঞ্জি	খানা/পরিবার	জনসংখ্যা
নিজপাট	৩৩	১৮৬
মোকাম পুঞ্জি	২২	১২৭
মোট	৫৫	৩১৩

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক, নিজপাট ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম ।

জৈন্তাপুর থানার নিজপাট গ্রামের তোয়াশী হাটি ও উজানীনগর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পাড়ায় মোট ৩৩টি খাসিয়া পরিবার বর্তমানে বসবাস করছে । পাশাপাশি বসবাসরত প্রতিটি খাসিয়া ঘর বাড়িই তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন স্বরুপ বর্তমান রয়েছে ।

জৈন্তাপুরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য খাসিয়া গ্রাম বা পুঞ্জি হচ্ছে মোকামপুঞ্জি । এই গ্রামটিতে বর্তমানে ২২টি খাসিয়া পরিবার বসবাস করছে । এই দুটি গ্রামের মোট জনসংখ্যা ৩১৩ জন ।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, বর্তমানে খাসিয়ারা নিজেদের জীবনধারা তিনটি ধর্মবিশ্বাসের সাথে যুক্ত করেছে । প্রথমতঃ বেশকিছু সংখ্যক খাসিয়া নিজেদের অতিপ্রাচীন খাসিয়া ধর্মেই অবস্থান করছে । আরেকটি অংশ হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি গুলো অনুসরণ করছে এবং বাদবাকী অংশ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে এই তিন ধর্মে অবস্থানকারীদের সংখ্যার বিন্যাস দেখানো হলো ঃ

সারনী - ২

খাসিয়া, হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মমতে অবস্থানকারীদের সংখ্যার বিন্যাস

ধর্ম	খানা/পরিবার	জনসংখ্যা
(প্রাচীন) খাসিয়া	২৫	১২৮
(হিন্দু) খাসিয়া	২০	১২১
(খ্রীষ্টান) খাসিয়া	১০	৬৪
মোট	৫৫	৩১৩

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক, নিজপাট ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম ।

২ নং সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, মোট ৩১৩ জন খাসিয়ার মধ্যে প্রাচীন খাসিয়া ধর্মমতে বিশ্বাসী রয়েছেন ১২৮ জন, হিন্দু ধর্ম গ্রহন করেছেন ১২১ জন, এবং খ্রীষ্টান ধর্ম পালন করেন ৬৪ জন খাসিয়া । প্রাচীন খাসিয়া ধর্মে অবস্থানরত খাসিয়ারা সুদুর অতীতে তাদের নিকটতম হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুধর্ম গ্রহন করে এবং পরবর্তীতে খ্রীষ্ট্রান ধর্ম গ্রহন করেছে । এভাবে ধর্মান্তরিত হবার প্রক্রিয়া সুদুর অতীত কাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত খাসিয়াদের মধো অব্যাহত রয়েছে ।

গবেষণা এলাকার খাসিয়াদের শিক্ষার যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নরুপ ঃ

সারনী - ৩

শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিন্যাস

শ্রেনী	জনসংখ্যা	শতকরা %
অশিক্ষিত	৯২	২৯.৩৯%
১ম - ৫ম শ্রেনী	৮৬	২৭.৪৮%
৫ম - ১০ম শ্রেনী	৮৫	২৭.১৫%
এস.এস.সি.	২৬	৮.৩১%
এইচ.এস.সি.	২২	৭.০৩%
স্নাতক ও তদুর্ধ	২	০.৬৪%
মোট	৩১৩	১০০%

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক, নিজপাট ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

৩নং সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, ১ম থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া জানা খাসিয়ার সংখ্যাই এই গবেষণা এলাকার মধ্যে বেশী । এর পরেই রয়েছে অশিক্ষিত বা নিরক্ষরদের অবস্থান । এস.এস.সি , এইচ.এস.সি. ও ডিগ্রী প্রাপ্ত খাসিয়ার অবস্থান মোট জনসংখ্যার ৮.৩১% এবং ৭.০৩% । উচ্চ শিক্ষার অবস্থা একেবারেই কম । মাত্র ০.৬৪% উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে বলে প্রতীয়মান হয় । এই এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিম্নরুপ ঃ

১)	কলেজ	-	১ টি
২)	সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	-	১ টি
৩)	বেসরকারী উচ্চ বিদালয়	-	৩ টি
৪)	বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	-	১ টি
৫)	মাদ্রাসা	-	১৭ টি
৬)	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	-	১৭ টি
৭)	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	-	৪৮ টি

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে বৃহত্তর বাঙ্গালী জনসাধারনের পাশাপাশি খাসিয়া নৃগোষ্ঠীভূক্ত ছাত্র -ছাত্রীরাও শিক্ষা গ্রহন করছে ।

(গ) <u>ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য</u> ঃ অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত হাওড়, জঙ্গল, পাহাড় ও নদীনালা বেষ্টিত মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জৈন্তাপুর থানা । এই থানার সম্পদ ও সৌন্দর্য্য সিলেট জেলাকে করেছে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই থানায় রয়েছে তৈল ও গ্যাসকূপ, পাথর কোয়য়রী, বালুমহাল, জলমহাল, চা-বাগান, তেজপাতার বাগান ইত্যাদি । জৈন্তার নৈসর্গিক মনোরম দৃশ্য, বনজসম্পদ, পানিসম্পদ, খনিজসম্পদ, মৎস সম্পদ ইত্যাদি দেশ বিদেশের পর্যটকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করেছে । জৈন্তাপুরের কমলালেবু, চা, আনারস, পান ইত্যাদি বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে । এই থানায় কম করে হলেও চৌদ্দটি চা বাগান রয়েছে । চা চাষের জনা জৈন্তাপুরের ভৌগলিক পরিবেশ বিশেষভাবে উপযোগী । শ্রীপুর, লালাখাল ও খান টি এস্টেট, প্রভৃতি চা বাগান গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এসব বাগানে উৎপন্ন হয়ে থাকে প্রচুর উন্নত জাতের চা, যা বিদেশে রপ্তানি করে প্রভূত পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করেছে বাংলাদেশ । তবে খাসিয়ারা এসকল চা বাগানের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

জৈন্তাপুরে রয়েছে বিস্তর বনভূমি । এই বনভূমি গুলিতে, সেগুন , গর্জন, জামরুল, গজারী, সহ আরও বহু মূল্যবান গাছ রয়েছে । প্রচুর ধান উৎপাদন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সব্জী, ফলফলাদির মধ্যে কমলা, আনারস, লেবু যথেষ্ট পরিমানে এ থানায় উৎপাদিত হয়। এছাড়া তেজপাতার উৎপাদনও হয় প্রচুর পরিমানে, বিখ্যাত খাসিয়া পান যা খাসিয়া পানচাষীরা উৎপন্ন করে থাকে। এর সাথে সাথে রয়েছে প্রচুর পরিমানে সুপারির ফলন । এই এলাকার সাথে যে গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি সমগ্র বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগের একমাত্র পথ তা হলো ৩৮ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সিলেট তামাবিল সড়ক । জৈন্তার সমতল ক্ষেত্রের উত্তরসীমায় রয়েছে খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে কাছাড় জেলা, দক্ষিনে সুরমা নদী, পশ্চিমে বরম, পিয়াইন ও তেলিখাল নামক তিনটি অপ্রশস্ত নদী রয়েছে । এসব নদীর পানি স্বচ্ছ ও শীতল । বিশেষ করে দু' একটি নদীর পানি এত স্বচ্ছ যে, তলদেশে চলাচলকারী মাছ ও অন্যান্য প্রানীর জলখেলা উপর থেকে অনায়াসে অবলোকন করা যায় ।

কৃষি বিষয়ক তথ্যাবলী ঃ

সারনী - ৪

জৈন্তাপুর থানার জমির বিন্যাস

জমির ধরন	জমির পরিমান
আবাদি জমি	৪২,৫১৬.০০ একর
এক ফসলী	২৫,৪১০.০০ একর
দুই ফসলী	১৭,৬২৫.০০ একর
তিন ফসলী	২,২৭৫.০০ একর
সাময়িক পতিত	৪,০৭২.০০ একর
চাষ অনুপযোগী	১১,৬০৮.০০ একর
চা বাগানের জমি	৫,৩৬৮.৩৮ একর
বন ভূমি	৩,৫৭৬.১৩ একর
মোট	১,১২,৪৫০.৫১ একর

উৎস ঃ কৃষি অফিস, জৈন্তাপুর থানা, সিলেট জেলা।

Dhaka University Institutional Repository

এই জমিগুলো বৃহত্তর বাঙ্গালী জনসাধারনের মালিকানায় যেমন রয়েছে তেমনি বেশ কিছু জমির মালিকানায় রয়েছে খাসিয়া জনসাধারণ ।

জৈন্তাপুর থানার মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ১,০৯,৬০০ জন (১৯৯৬-৯৭) । মোট খাদ্য চাহিদা হচ্ছে ১৮,১৩৫.০০ মেঃ টন । খাদ্য উৎপাদন হয় ১৭,৮৩১.০০ মেঃ টন । খাদ্য ঘাটতি রয়েছে ৩০৪.০০ মেঃ টন। এই এলাকায় প্রধান প্রধান উৎপাদিন ফসলের মধ্যে ধানের উৎপাদন হয় ৯০% এবং অন্যান্য (তরমুজ, আনারস, শাক-সব্জি ইত্যাদি) ১০% । গবেষণা এলাকায় প্রায় প্রতিবৎসরই পাহাড়ী ঢল (flash flood) নামে । এসময় এলাকার নদীতীরবর্তী স্থানগুলো প্লাবিত হয় । যে কারনে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে । তাই প্রচুর ধান উৎপন্ন হওয়া সত্বেও এলাকায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় ।

গাছ পালা ঃ কাঁঠাল, কমলা, বিভিন্ন লেবু জাতীয় গাছ, চা, নারিকেল, তেজপাতা ও বিভিন্ন প্রকার বনজ বৃক্ষ ।

আবহাওয়া ঃ নাতিশীতোষ্ণ, (শীতকালের স্থায়ীত্ব ও শীতের তীব্রতা তুলনা মূলকভাবে বেশী । বৃষ্টিপাত বেশী, বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃষ্টি বহুল স্থান লালাখাল এই থানাতেই অবস্থিত) । প্রচুর বারিপাত এলাকার জনজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে । যেমন ঃ প্রচুর বারিপাতের ফলে এলাকার নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় । রাস্তাঘাটের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় । প্রচুর বারিপাত জনসাধারনের জীবনযাত্রাকে পর্যুদস্ত করে তোলে । অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে ফসলের যেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় তেমনি এটা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক গতিময়তাকে স্থবির করে দেয় । দরিদ্র জনসাধারন বাইরে কাজকর্মে যেতে পারে না , ফলে আর্থিক দিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে । তবে চা গাছের জন্য এধরনের বৃষ্টিপাত উপযোগী বিধায় এই এলাকায় চা উৎপাদন ভাল হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ফসলের উপর আবহাওয়ার প্রভাব ঃ

(ক) আগাম শীতের কারনে রোপা আমন ধান আগাম রোপন করতে হয়, না হলে ফুল আসে না।

(খ) আগাম শীতের কারনে আগাম তরমুজ চাষ (নভেম্বর-মার্চ) করতে হয়। দাম পাওয়া যায় বেশী।

(গ) অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের কারনে গ্রীষ্মকালীন শাক্সবজির উৎপাদন খুবই কম।

(ঘ) বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ায় চা উৎপাদন ভাল হয়।

এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ভৌগলিক পরিবেশ খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর জীবন যাত্রাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এর পাশা পাশি রয়েছে সুবিশাল পার্বত্য বনভূমি, যার নিবিড় সান্নিধ্য, খাসিয়াদের বহুগত সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন; অর্থ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক কর্মকান্ড, ধর্ম বিশ্বাস এবং জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্য এক ব্যতিক্রম ধর্মী প্রভাব বিস্তার করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বস্তুগত সংস্কৃতি

গ্রাম ও ঘরবাড়ি ঃ সিলেট জেলার খাসিয়াদের আবাসিক এলাকাগুলো *পুঞ্জি* নামে পরিচিত। যে অর্থে বাংলায় গ্রাম শব্দটি ব্যবহার করা হয় অনেকটা সে অর্থে *পুঞ্জি* শব্দটি খাসিয়ারা ব্যবহার করে থাকে। বেশ কয়েকটি খাসিয়া ঘরবাড়ি নিয়ে একটি *পুঞ্জি* গঠিত হয়। প্রতিটি *পুঞ্জির* একজন প্রধান থাকে, যাকে খাসিয়ারা *মন্ত্রী* নামে অভিহিত করে। এই *পুঞ্জিগুলো* তারা গড়ে তোলে সমতল থেকে উঁচুতে। সাধারণতঃ নদী বা ঝরণার ঢালে খাসিয়ারা তাদের *পুঞ্জিগুলো* গড়ে তোলে। তাদের বাসস্থান যেন সহজে নদীর পানি বা বন্য জন্তুর আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাই কাঠ বা পাথর অথবা সিমেন্ট এর তৈরী উঁচু পিলারের উপর তারা ঘরবাড়ি গুলো তৈরী করে। এই পিলার সাধারণত তিন থেকে চার ফুট উঁচু হয়। বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য কাঠ বা সিমেন্ট দিয়ে পাকা সিঁড়ি তৈরী করে। তবে এই পিলার গুলো কতটা উঁচু হবে তা নির্ভর করে সেই এলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের উপর। যেমনঃ জৈন্তাপুর থানার নিজপাট এলাকার ঘরবাড়ি গুলো খুব বেশী উঁচু খুঁটির উপর তৈরী নয়। এখানকার ঘরবাড়ি ভূমির কাছাকাছি তৈরী করার অন্যতম কারণ হলো খাসিয়াদের বসবাসের স্থানই এখানে অপেক্ষাকৃত উচুঁ ভূমি যেখানে বন্যার পানিতে আক্রান্ত হবার ভয় নেই। এই এলাকার খাসিয়া ঘরবাড়িগুলো অনেকটা এলাকার বাঙ্গালী ঘরবাড়ির মত দেখতে।

মাটি থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পর ঘরের সামনেই একটি বারান্দা থাকে সেটাকে খাসিয়ারা *ধারি-প্রাং* বলে থাকে। আর ঘরের পিছনের বারান্দাকে বলে *ধারি-রেন*। সাধারণত এই বারান্দা বা *ধারি* তৈরী হয় শক্ত কাঠের তক্তা বিছিয়ে। যে কোন খাসিয়া ঘরের সামনের প্রথম অংশটুকু হলো এই *ধারি*। ঘরের সম্মুখবর্তী এই অংশটুকুকে তারা নানাভাবে ব্যবহার করে থাকে। যথা ঃ

ক) পান তুলে এনে সেগুলো গুছিয়ে তুলে রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করে ।

গ) বয়স্করা অবসর সময়ে গল্পগুজব করে ।

ঘ) *ধারি* সংলগ্ন খুঁটিতে পান সংগ্রহ করার ঝুড়ি *(থাবা)* ঝুলিয়ে রাখে ।

ঙ) অনেক সময়ে গরীব খাসিয়ারা অতিথি আপ্যায়নের কাজে ব্যবহার করে ।

চ) ধারির নীচে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে রাখে ।

এছাড়াও নানাভাবে তারা এই বারান্দা বা পিছনের বারান্দাটিকেও তারা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে । তবে পিছনের বারান্দা সামনের বারান্দার মত প্রশস্ত হয় না । অনেক খাসিয়া বাড়ির মেয়েদের স্নানাগার হিসেবে পিছনের বারান্দার একটি অংশ ব্যবহৃত হয়।

খাসিয়া নৃগোষ্ঠী অত্যন্ত পরিশ্রমী । তারা তাদের ঘরবাড়িগুলোকে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে এবং নিজেরাও পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি থাকতে ভালবাসে । খাসিয়া ঘরবাড়ি তারা নিজেরাই তৈরী করে থাকে তবে প্রয়োজনে স্থানীয় বাঙ্গালী কারিগরদের সহায়তা মজুরীর বিনিময়ে নিয়ে থাকে ।

একটি আদর্শ খাসিয়া বাড়িতে তিন থেকে চারটি কক্ষ এবং সম্মুখ ও পিছনভাগে দুটি বারান্দা থাকে ।

বসার ঘর (*ইয়ং গনড়ুর)* ঃ সম্মুখের বারান্দা বা *ধারি* সংলগ্ন ঘরটিই খাসিয়াদের বসার ঘর । এই ঘরটি ব্যবহৃত হয় অতিথি আপ্যায়নের কাজে । অনেক খাসিয়া বাড়ির মেঝে পাকা করা হয় আবার অনেক বাড়ি কাঠের পাটাতনের উপর তৈরী । কিছু কিছু খাসিয়া বাড়িতেই বাঙ্গালীদের মত চেয়ার টেবিল থাকে বসার জন্য । অবশ্য ভেদে অনেকে মোড়া বা কাঠের বেঞ্চ অথবা মাদুরও (বেত বা *মুক্তা* গাছের তৈরী) বসার জন্য ব্যবহার করে । ধনী খাসিয়াদের বসার ঘরে আধুনিক সোফা সেট ব্যবহার করতে দেখা যায় । পরিবারের বয়স্করা অনেক সময় এই কক্ষে রাত্রিযাপন করে থাকে । এই ঘরটিতে অনেক সময় তারা বিক্রির জন্য সুপারি স্তূপিকৃত করে রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

শোবার ঘর (*থাউ থিয়ে*) ঃ বসার ঘরের সংলগ্ন ঘরগুলোই খাসিয়াদের শয়ন কক্ষ। সাধারণতঃ প্রতি খাসিয়া বাড়িতেই দুটি শয়ন কক্ষ থাকে। অবস্থাভেদে এই ঘরের আসবাবপত্র ও ভিন্ন ধরনের হয়। ধনী খাসিয়ারা খাট, বিছানা, বালিশ শয়নের জন্য ব্যবহার করে থাকে। তবে অধিকাংশ বাড়িতেই কাঠের চৌকিতে তারা শয়ন করে। তবে দরিদ্র খাসিয়ারা শীতল পাটিতেই (বেতের তৈরী পাটি) শয়ন করে থাকে।

বসার ঘরের বরাবরে একটি লম্বা কক্ষ থাকে সে কক্ষটি খাসিয়ারা স্টোর রুম (বিভিন্ন দ্রব্যাদি সংরক্ষনের জন্য ব্যবহৃত কক্ষ) হিসেবে ব্যবহার করে। এই কক্ষটিতে তারা ধান, চাল, মশলা থেকে শুরু করে সংরক্ষন উপযোগী সকল খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। এই ঘরের দেয়ালে তারা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার গুলো দাঁড় করিয়ে রাখে। খাসিয়ারা অনেকেই সুপারিকে পঁচিয়ে খায় এবং বিক্রি করে। এক ধরনের বড় মাটির *মটকা* বা কলসীতে তারা এই সুপারি পঁচিয়ে জমা করে রাখে। সাধারণত এই কক্ষটির কোনায় তারা সুপারি পঁচানোর মটকাগুলো সংরক্ষন করে। সুপারি পঁচিয়ে খাওয়া খাসিয়ারা বিশেষভাবে পছন্দ করে এবং এগুলো বিক্রি করে তাদের যথেষ্ট আয় হয়।

রান্নাঘর (*ইঁয়ুং- ছেটজা*) ঃ বাড়ির সবচাইতে পিছনের অংশে রান্নাঘর থাকে। তবে খাসিয়াদের রান্নাঘর খুব প্রশস্ত নয়। চুলা (*খুরি*) গুলো মাটির তৈরী এবং জ্বালানী হিসাবে কাঠ ও শুকনো পাতা বা কয়লা ব্যবহার করে থাকে। রান্নাঘরের দেয়ালে ব্যবহৃত তৈজস পত্রাদি রাখার জন্য বড় করে কাঠের তাক তৈরী করে। খাসিয়ারা পিতল এবং এলুমিনিয়ামের তৈরী তৈজসপত্রাদি রান্না এবং খাবার কাজে ব্যবহাব করে। এলুমিনিয়ামের তৈরী বিভিন্ন জিনিসপত্র তারা এত পরিষ্কার করে রাখে যে সবসময় সেগুলো নতুনের মতই ঝকঝকে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা – ৩

একটি খাসিয়া বাড়ি তৈরীর উপকরণ ঃ

১) কাঠ

২) বাঁশ

৩) ইকড় (সরু বাঁশ জাতীয় গাছ)

৪) ছন

৫) টিন

৬) লোহা

৭) লাল মাটি

৮) রড

৯) বালি

১০) ইট

১১) সিমেন্ট

একটি আদর্শ খাসিয়া বাড়ি তৈরী করতে খরচ পড়ে সাধারনত ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকার মত । তবে সচ্ছল খাসিয়ারা এর থেকে অনেক বেশী ও খরচ করে ঘরবাড়ি তৈরীর জন্য। আবার অসচ্ছল খাসিয়ারা অনেক কম খরচে কোনোমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেয় বেঁচে থাকার জন্য। অনেক খাসিয়া বাড়ির মেঝে পাকা হলেও কোনো বাড়ির ছাদই তারা পাকা করেনা ভূমিকম্পের কারণে । ঘরের দেওয়াল তৈরী করে ইকড় (বাঁশ জাতীয় উদ্ভিদ) দিয়ে। এর উপর লাল মাটির প্রলেপ দেয়। অনেক খাসিয়াই ঘরের দেয়ালে চুন দিয়ে রং করে।

কোন খাসিয়া বাড়ি সংলগ্ন সম্মুখে এবং পিছনে একটি পারিবারিক বাগান থাকে। এই বাগানে প্রত্যেকেরই নিজস্ব পানের বরজ (ইয়ুং পথি) থাকে। এছাড়াও নানা রকম

Dhaka University Institutional Repository

ফলের গাছ যেমন, লেবু, কাঁঠাল, কমলা, তেজপাতা, গোলমরিচ সহ অনেক রকম ফলের গাছ থাকে। প্রতিটি বাড়ি সংলগ্ন এই বাগান করার রীতি অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাদের মধ্যে রয়েছে বলে জানা যায়। এই রীতি পর্যবেক্ষনে প্রাচীন উদ্যান কৃষিতে তারা অভ্যস্ত ছিল বলেই প্রতীয়মান হয় । বাড়ির পিছন দিকে ছোট ঘর তৈরী করে তারা মোরগ-মুরগী পালন করে। প্রত্যেক পরিবারেই এটা করা হয় । কারণ খাসিয়ারা প্রায় সব উৎসবেই মোরগ উৎসর্গ করে থাকে। যে উচুঁ খুঁটি বা পিলারের উপর ঘরবাড়ি তৈরী করে সেই অংশে ঘরের নীচে তারা শুকরও পালন করে থাকে।

লেট্রিন ঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করার জন্য তারা বাড়ির কাছাকাছি কাঁচা পায়খানা তৈরী করে থাকে। অনেক ধনী খাসিয়ারাও কাঁচা লেট্রিন ব্যবহার করে থাকে । তবে প্রায় খাসিয়াদেরই দেখা যায় বাড়ী সংলগ্ন পার্শবর্তী জঙ্গলে প্রাকৃতিক কর্মটি সম্পন্ন করতে । অধুনা কয়েকটি ধনী খাসিয়া বাড়ীতে পাকা লেট্রিনের ব্যবস্থা দেখা যায় ।

খাদ্য ঃ খাসিয়ারা সাধারণত দিনে দুইবার আহার করে। একবার খুব ভোরে বা সকালে আর একবার সন্ধ্যায়। কিন্তু যারা বাইরে কাজ করতে যায় তারা সাথে খাবার নিয়ে যায় । সুপারি পাতার নিচের অংশ বা *খোল* দিয়ে এক ধরনের পাতলা কাপড়ের মত তৈরী করে এর মধ্যে ভাত বা পিঠা মুড়িয়ে তারা খাবার জন্য নিয়ে যায়।

ভাত, শুকনা মাছ (শুটকী মাছ), মাংস খাসিয়াদের প্রধান খাদ্য। মাছ শুকিয়ে এবং পুড়িয়ে তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে। তারা সব রকম সবজি এবং মূল জাতীয় তরকারী (যেমন কচু) খেয়ে থাকে। সবজি বা তরকারী সাধারণত সিদ্ধ করে ভাতের সাথে খেয়ে থাকে। তবে সব ধরনের তরকারীতে তারা খাবার তৈল ব্যবহার করে না । সব্জি বা তরকারী পানিতে সিদ্ধ করার সময় এতে বিভিন্ন মসলা যেমন - আদা, হলুদ, মরিচ প্রয়োজনমত ব্যবহার করে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সব ধরনের বন্য প্রাণী ও জন্তু তারা খেয়ে থাকে যেমন শুকর, বনমোরগ এবং বনে পাওয়া যায় এমন জন্তু জানোয়ারের মাংস। কিন্তু কুকুরের মাংস তারা কখনও খায় না। খাসিয়াদের এলাকায় জন্মে এমন সব ধরনের ফলমূল তারা খায়। মোরগ এবং শুকরের মাংস তাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। মাংস তারা সব রকম মসলা যেমন, হলুদ, মরিচ, আদা, লবণ সহযোগে সিদ্ধ করে খেয়ে থাকে।

খাসিয়ারা মদ *(খিয়েত)* পান করে থাকে। এই মদ তারা বাজার থেকে কিনে আনে অথবা নিজেরাও ভাত পঁচিয়ে বাড়িতে তৈরী করে। অধিকাংশ খাসিয়া পরিবারই ভাত পঁচিয়ে নিজেদের খাবারের জন্য মদ *(খিয়েত)* তৈরী করে। তবে কোনো কোনো পরিবার ঘরে তৈরী মদ অন্যদের কাছে বিক্রিও করে থাকে। (খিয়েত তৈরীর প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক সংগঠনে বর্ননা করা হয়েছে।)

পান এবং সুপারি খাসিয়া জীবনের এক অপরিহার্য জিনিস। প্রচুর পান সুপারি এরা নিজেরা খেয়ে থাকে এবং অতিথি আপ্যায়নেও ব্যবহার করে। খাসিয়া সমাজের বিশেষ রীতি অনুযায়ী প্রথমে তারা অতিথিকে সুপারি এবং পরে পান দিয়ে অভ্যর্থনা করে। এছাড়া পান সুপারী বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায়।

একটি বিশেষ খাসিয়া রান্না ঃ

জা-ড ঃ শুকরের মাংস বা মোরগের মাংস দিয়ে এই বিশেষ খাবারটি রান্না করা হয়। কোন পাত্রে পানি এবং বিভিন্ন রকম মশলা যেমন- হলুদ, মরিচ, আদা, লবণ সহযোগে মাংস সিদ্ধ করে নেয়া হয়। পরে ঐ পাত্র থেকে সিদ্ধ মাংসগুলো তুলে নিয়ে অন্য পাত্রে রেখে দেয়া হয়। রান্না করা মাংসের রয়ে যাওয়া পানিতে চাল ফুটিয়ে নিয়ে ভাত রান্না করা হয়। অতঃপর মাংস সহযোগে আহার করা হয়। কোন উৎসবের দিনেই সাধারণতঃ খাসিয়ারা *জা-ড* রান্না করে থাকে। এ ধরনের উৎসবের রান্না তারা বাড়ীতেই করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে এবং রান্নাঘর সংলগ্ন ঘরে আহার করে। খাবার গ্রহনের জন্য তারা কাঠের তৈরী পিড়িতে বসে এবং অনেক সময় বেতের তৈরী মাদুরেও খাবারের জন্য উপবেশন করে।

পোষাক-পরিচ্ছদ (Dress) ঃ খাসিয়া সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই বিশেষ ধরনের পোষাক পরিধান করে থাকে।

মহিলারা *কা-জেইন-ছেম* নামক পোষাক পরিধান করে। সিলেট জেলার খাসিয়া মহিলাদের পোষাককে তিনভাগে ভাগ করে উল্লেখ করা যায়। প্রথম অংশটি অনেকটা বাঙ্গালীদের সেলাই না করা লুঙ্গির মত। যেটির দুই প্রান্ত ডান হাতের নিচ দিয়ে নিয়ে বাঁম কাঁধে গিট বেঁধে মহিলারা পরে থাকে। যা সবসময় হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এ্যাপ্রোনের মত ঝুলতে থাকে। এর নীচে তারা ব্লাউজ বা সেমিজ ব্যবহার করে। শরীরের নীম্নাংশে মহিলারা *থাড-ছেম* নামক বস্ত্রখন্ড ব্যবহার করে যা হাঁটুর বেশ নীচ পর্যন্ত আবৃত করে রাখে। বিশেষ উৎসবের দিনে তারা এসব পোশাক (বেশ দামী কাপড়ের তৈরী যেমন- সিল্ক) ব্যবহার করে এবং গহনা পত্রও পরিধান করে।

খাসিয়া পুরুষেরা অনেকটা বাঙ্গালীদের মতই পোশাক পরে থাকে। সাধারণতঃ শার্ট, পেন্ট, গেঞ্জি এসব পোশাক তারা পরিধান করে থাকে। কাজে যাওয়ার সময় তারা গেঞ্জি এবং লম্বা পেন্ট পরিধান করে। ঘরে অবসরযাপনকালে তারা বাঙ্গালী পুরুষদের মতই লংগী, গেঞ্জি ব্যবহার করে। ছোট ছেলেমেয়েরাও বাঙ্গালীদের শিশুদের মতই ছোট শার্ট, পেন্ট, গেঞ্জি, ফ্রক ইত্যাদি পোষাক পরিধান করে থাকে।

গহনাপত্র বা অলংকার ঃ খাসিয়া মেয়েরা খুবই অলংকার প্রিয়। নানা ধরনের গহনাপত্র তারা ব্যবহার করতে ভালবাসে। যেমন ঃ *কে-পেইন* (গলার হার), *খা-ইলা* (কানের দুল), *খু-ডু* (চুড়ি) ইত্যাদি। উৎসবের দিনে বিশেষ করে *হকতই* উৎসবের সময় তারা উল্লেখযোগ্য গহনাপত্র পরে আনন্দ উৎসবে যোগদান করে। খাসিয়া রমনীদের স্বর্ণালংকার বিশেষ প্রিয় হলেও সব সময় তারা স্বর্ণ-গহনা ব্যবহার করে না। অনেকে শুধু কানে ছোট ইয়ারিং পরে থাকে। তবে পাথর বা পুঁতি জাতীয় জিনিষের মালা তারা সবসময় গলায় দেয়। তবে মহিলাদের বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হলে তারা আর তেমন

Dhaka University Institutional Repository

অলংকার পরে না । বর্তমানে খাসিয়া মহিলারাও ইমিটেশনের তৈরী নানা অলংকার পরিধান করে থাকে। এটা সাম্প্রতিক সময়ের একটা পরিবর্তন হিসাবে উল্লেখ করা যায় ।

বাদ্য যন্ত্র ঃ খাসিয়ারা হাস্যকৌতুক এবং সংগীত প্রিয় নৃগোষ্ঠী । প্রায় সব উৎসব এবং পার্বনে তারা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। এ সময় তারা যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে সেগুলি নিম্নরুপ ঃ

১) *কা-শারাতি* / (বাঁশী) - মৃতদেহ সৎকারের সময় বাজানো হয় ।

২) *জিপুট ছু* - গাইটার (গীটার)

৩) *কা-দুইতারা* (গীটার - এর তার গুলো মুগা সিল্কের সুতার তৈরী)।

৪) *কা-মরিনাস/* (ভায়োলিন)

৫) *কা- নাকড়া* (ঢোল) ।

এ সব অনুষ্ঠানে তাদের জীবনের আনন্দ বেদনার অভিব্যক্তি বিবিধ সুর মুর্ছনায় প্রতিধ্বনিত হয় । গানের সময়ে তারা যখন আবহমান কালের প্রচীন উল্লাসময় নৃত্য ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে তখন তা তাদের জীবনের সংস্কৃতির ধারাকে বৈচিত্রময় ও পরিপূর্ণ করে তোলে । খাসিয়া সমাজে মৃতদেহ সৎকারের সময় *বাঁশী* বাজানো হয় । এছাড়া হিন্দু খাসিয়াদের হকতই অনুষ্ঠানে, খীষ্টান খাসিয়ারা খ্রীষ্টমাস ক্যারোলের সময় নৃত্যগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানগুলোকে উৎসব মূখর করে তোলে । (খাসিয়াদের অনুষ্ঠানগুলো 'আচার অনুষ্ঠান' নামক অংশে বর্ণনা করা হয়েছে) ।

গৃহস্থালীর জিনিসপত্রঃ খাসিয়ারা অনাড়ম্বর এবং সহজ সরল জীবন যাপন করে । জীবনযাপনের জন্য তাঁরা প্রচুর পরিশ্রম করে থাকে । পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাদের জীবনের সংগতিবিধানের জন্য প্রতিদিনই গৃহে এবং বাইরে নানা কর্তব্য পালন করে থাকে । পানচাষ এবং বাগানে লেবু, কমলা, আনারস , সুপারি ইত্যাদি বৃক্ষরোপন ও তাদের পরিচর্যা তাদের জীবনের অপরিহার্য দিক । এসব কাজের পাশাপাশি ঘর গৃহস্থালির কাজেও

Dhaka University Institutional Repository

তারা নিজেদের দিনমানব্যাপী ব্যস্ত রাখে । যে সকল সামগ্রী ও তারা গৃহে ও মাঠে কাজের জন্য ব্যবহার করে সেগুলোর একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

তালিকা - ৪

খাসিয়াদের ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদির তালিকা

খাসিয়া শব্দ	বাংলা শব্দ
তসলা	হাঁড়ি/পাতিল
কা-প্লিয়াং/ডিংকুই	থালা
তর-উয়াং	কড়াই
বাটা	বাটি
খুরি	কাপ
কা-ছিয়াং	বড় চামচ
ছে-ঝোর	খুন্তি (মাছ বা তরকারী নাড়ার জিনিস)
কুম	কলসী
ছিয়াং চা	চা চামচ

উৎস ঃ ফিল্ড ওয়ার্ক, নিজপাট ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম ।

তালিকা -৫

খাসিয়াদের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও অন্যান্য দ্রব্যাদির তালিকা

খাসিয়া শব্দ	বাংলা শব্দ
ল্যানটেন	হারিকেন
পারডিপ	প্রদীপ
চং ইসমেন	আগুন ফুঁ দেবার বাঁশের তৈরী লাঠি
সরতা	সুপারি কাটার যন্ত্র
রি-ইসমেন	দিয়াশলাই
চং কুয়াই/খ্রাই-কুই	সুপারি রাখার পাত্র
বা-খু	কোদাল
উ-খারা	বাগানে নেবার ঝুড়ি (ছেলেদের)
কা-খ	বাগানে নেবার ঝুড়ি (মেয়েদের)
কা-পালাইন	মাছ ধরার জাল

Dhaka University Institutional Repository

উ-খোয়াই	বড়শী
বাতুর-ছ্যায়	ছোট ছেলেদের পাখি মারার যন্ত্র
উ-হাম/ফ্রুট	তীর
কা-রিনতেই	ধনুক
ফা-ছিলই	বন্দুক
থাবা	পান তুলে আনার ঝুড়ি
উস্নার	পান বহনের ঝুড়ির ফিতা
উ-আইত	দা
উস-ভাই	কুঠার
খুরিজা/কুরি	চুলা
ছিল্লেয়	মাদুর বা চাটাই
জেং কেইন/কা-ইউ-মই	মই
মউ-খিউ-হে	নিড়ানি

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক, নিজপাট ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম ।

যানবাহন ঃ খাসিয়ারা যাতায়াত ও যোগাযোগের জন্য হাঁটা বা পায়ে চলা পথই বেছে নেয় । অরন্যচারী পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীর জন্য হাঁটাই সর্বাপেক্ষা প্রচলিত যাতায়াত ও যোগাযোগ মাধ্যম। খাসিয়া *পুঞ্জির* পার্শ্বে এবং প্রবেশের জন্য এ কারনে সরু পায়ে চলা পথই সহজে চোখে পড়ে । খাসিয়ারা পাহাড়ে ওঠানামার ক্ষেত্রে খুবই পারদর্শী । যার কারনে তাহাদের পায়ের গোড়ালী শক্ত এবং পেশীবহুল হয়ে থাকে ।

পুঞ্জি থেকে লোকালয়ে আসার জন্য তারা পায়ে হাঁটা পথই ব্যবহার করে । তবে প্রধান সড়ক দিয়ে কোথাও যাতায়াতের জন্য তারা বাস ব্যবহার করে ।

খেলাধুলা ঃ খাসিয়ারা অবসর সময়ে প্রচুর খেলাধুলা করে থাকে । তীর ধনুক দিয়ে প্রতিযোগিতা এবং মল্লযুদ্ধ তারা বেশ বড় করে আয়োজন করে খেলে থাকে । এছাড়া একটি লাঠির দুপাশ থেকে দুজন টানাটানি করাও তাদের মজার খেলা (অনেকটা দড়ি টানাটানির মতো) । লং জাম্প ও শর্ট জাম্পও তারা খেলে থাকে । ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি ওড়ানো, মাটিতে গর্ত করে কড়ি দিয়ে খেলা (মার্বেল খেলার মত) করে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক সংগঠন

পরিবার (Family) : পরিবার (ইয়ুং) হল মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের এক বিশ্বজনীন রূপ। পরিবারই সমাজের প্রাথমিক একক বা উপাদান। এর থেকে সৃষ্টি হয় জনসম্প্রদায়। সৃষ্টির আদি অবস্থা থেকে শুরু করে আজ অবধি পরিবার গঠন ও প্রকৃতিগত দিক থেকে ব্যপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানব সমাজে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অব্যাহত রেখেছে।

খাসিয়া সমাজেও পরিবার একটি মৌলিক সংগঠন। অন্যান্য মানব সম্প্রদায়ের মতই খাসিয়ারাও বিবাহের মধ্য দিয়েই পরিবাবের সূচনা করে থাকে। খাসিয়া সমাজে দুই ধরনের পরিবার দেখা যায়। একক (nuclear) পরিবার এবং একান্নবর্তী বা যৌথ (joint or extended) পরিবার।একক পরিবার গঠিত হয় স্বামী স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান সন্ততি নিয়ে আর যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারে থাকে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, অবিবাহিতা বোন, স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি। গবেষণাধীন গ্রামগুলোতে উপরোক্ত দুই ধরনের পরিবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। খাসিয়া সমাজে যৌথপরিবারই বেশী পরিলক্ষিত হয় যেখানে মাতা-পিতা, তাদের পুত্র-কন্যা (কিন্তু পুত্রবধু নয়), মাতার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, মাতার অবিবাহিত ভাই, কন্যার স্বামী ও তাদের পুত্রকন্যা থাকেন। কনিষ্ঠা কন্যা ব্যাতিত অন্যান্য কন্যার বিবাহের পরে তাদের দুই বা ততোধিক সন্তানের জন্মের পর উক্ত কন্যা স্বামীসহ পৃথক একক পরিবার গঠন করেন। সাধারণত মাতার বাড়ীর পাশেই ঘর তৈরী করে তারা বসবাস করে। তবে কনিষ্ঠা কন্যা মায়ের বাড়ীতেই বিবাহের পূর্বে এবং পরে বসবাস করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া সমাজে পরিবার ব্যবস্থার চারটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা ঃ

(ক) **কর্তৃত্ব (Authority)** ঃ খাসিয়া পরিবার মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal)। খাসিয়া সমাজে পরিবারের কর্তৃত্ব স্ত্রীর হাতে ন্যাস্ত থাকে বলে স্বামীর ভূমিকা সেখানে গৌন। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন, অর্থের হিসাব নিকাশ, ব্যবসা পরিচালনা সকল ক্ষেত্রেই এই সমাজে স্ত্রীর প্রাধান্য বেশী। তবে একথা বলা যায় না যে, স্বামীর কোন ভূমিকা একেবারেই নেই। সকল ক্ষেত্রে স্বামী তার পরিশ্রম ও মেধা কাজে লাগিয়ে পরিবারের মূল চালিকা শক্তিকে সচল রাখে। মাতার বা স্ত্রীর প্রাধান্যের অর্থ হলো মাতৃকূলের প্রাধান্য। মাতা তার পুত্রকন্যা সহ নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই তার ও মাতৃকূলের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব পরিবারে বজায় থাকে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বিধায় খাসিয়া পরিবারে থাকেন মাতা, তার পুত্র-কন্যা (কিন্তু পুত্র বধু নয়) তার (মাতার) ভাই ও বোন (কিন্তু ভ্রাতৃবধু নয়), কন্যার পুত্রকন্যা ইত্যাদি।

(খ) **বংশানুক্রম অথবা নাম ও পদবীর ভিত্তিতে (Line of Descent)** ঃ খাসিয়া পরিবার মাতৃগোষ্ঠী নির্নিত (matrilineal matrionymic)। খাসিয়া সমাজে মাতৃকূলের পরিচয়েই সন্তান পরিচিত হয় বিধায় খাসিয়ারা মাতৃনামিক পরিবার গোষ্ঠী। সন্তান-সন্ততি মাতার বংশানুক্রমে পরিচিত হয় এবং মাতার পদবী ব্যবহার করে থাকে। এ কারণে খাসিয়া সমাজে একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো - *'লং জাইদ না কা কিনথেই' (from the woman sprang the clan)* অর্থাৎ নারীই হলো গোষ্ঠী জীবনের উৎস।

(গ) **উত্তরাধিকার (Inheritance; Succession)** : খাসিয়া সমাজে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতার নিকট থেকে কন্যার উপর বর্তায়। তবে খাসিয়া সমাজে কনিষ্ঠা কন্যাই সম্পত্তির সিংহভাগ পেয়ে থাকে। এই কনিষ্ঠা কন্যা পরিবারে বিশেষ স্থান লাভ করে থাকে। *কা-খাদুহ (ka khadduh)* নামে পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা সম্বোধিত

Dhaka University Institutional Repository

হয় । সে মাতার মূল বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে । কনিষ্ঠা কন্যার বাড়িটি *কা ইয়ুং সেং* (ka iing seng) নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং এই বাড়িতেই পারিবারিক এবং পূর্বপুরুষের জন্য কৃত সকল অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে । এছাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত সকল সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কনিষ্ঠা কন্যার বা *কা-খাড়ু* বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে । যে কারনে খাসিয়ারা *"কা বাট কা নিয়াম"* (*"ka bat ka niam"*) অর্থাৎ কনিষ্ঠা কন্যাই ধর্মের ধারক (youngest daughter holds the religion) - এই নীতিতে বিশ্বাস করে । কনিষ্ঠা কন্যা ব্যাতীত অন্যান্য কন্যারা সীমিত পরিমান সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে । কনিষ্ঠা কন্যা মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ লাভ করে এবং অন্যান্য কন্যারা অবশিষ্ট সম্পত্তি লাভ করে থাকে। (অর্থনৈতিক সংগঠন শীর্ষক অধ্যায়টিতে খাসিয়া সমাজের *'কা-খাড়ু'* নামক প্রতিষ্ঠানটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। খাসিয়া উত্তরাধিকারের নিয়মানুযায়ী খাসিয়া পুরুষ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না ।

(ঘ) <u>স্বামী বা স্ত্রীর বাসস্থান (**Residence of the Spouse**)</u> ঃ খাসিয়া সমাজে বিবাহের পর স্বামী তার স্ত্রীর মাতার বাড়িতে চলে আসে এবং সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে । অর্থাৎ খাসিয়া সমাজে মাতৃবাস রীতির (matrilocal residence) প্রচলন রয়েছে । তবে সাধারণত একটি বা দুটি সন্তানের জন্মের পর খাসিয়া দম্পতি স্ত্রীর মাতার বাসস্থানের পার্শ্বে তাদের জন্য আলাদা ঘর তৈরী করে বসবাস শুরু করে । কিন্তু এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম হলো কনিষ্ঠা কন্যা যেহেতু মাতার মূলবাড়িটি লাভ করে সুতরাং বিবাহের পূর্বে বা পরে আজীবন সে এই বাড়িতেই বসবাস করতে পারে । কনিষ্ঠা কন্যাকে তাই অন্যান্য কন্যাদের মত বিবাহের পরবর্তীতে সন্তানের জন্মের পরে মাতার বাড়ির পার্শ্বে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয় না । স্বামীর জীবিতবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামীকে পুনরায় তার মায়ের বাড়িতে ফিরে যেতে হয় । খাসিয়াদের মধ্যে *সিনতেং* গোত্রের পুরুষেরা বিবাহের পর স্ত্রীর বাড়ীতে শুধুমাত্র রাত্রিযাপন করে । দিবাভাগে তার

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের বাড়ীতে অবস্থান করে এবং নানা কাজে ব্যাপৃত থাকে । এটি খাসিয়া বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষের বাসস্থান নির্ধারণ রীতির একটি ব্যাতিক্রম । এক্ষেত্রে গতানুগতিক মাতৃবাস রীতিটি পুরোপুরি প্রযোজ্য হয় না । কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা এই যে, *সিন্‌তেং* খাসিয়াদের ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাব কঠোর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । একজন *সিন্‌তেং* খাসিয়া পুরুষের সারাজীবনব্যাপী আয় ব্যয়ের হিসাব তার মাতার নিকটই বুঝিয়ে দিতে হয় । স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির জন্য তাকে বিশেষ কোন দায়িত্ব পালন করতে হয় না । তবে *সিন্‌তেং* গোত্র ব্যতীত অন্যান্য গোত্রের খাসিয়াদের বেলায় এই নিয়মটি প্রযোজ্য নয় ।

খাসিয়া পরিবারে মাতা'ই হন পরিবাবেব কর্ত্রী । তিনি যেমন সম্পত্তির মালিক তেমনি সকল সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে তাঁর রয়েছে বিশেষ ভূমিকা । পরিবারের সকল সদস্য মা'কে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে । পরিবারের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাবে রাখেন পরিবারেব কর্ত্রী । খাসিয়া সমাজ মাতৃপ্রধান বিধায় সর্বক্ষেত্রে মাতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ।

খাসিয়া সমাজে পুরুষের নিদির্ষ্ট ভূমিকা রয়েছে । তিনি বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মাতা'র বাড়ীতে থাকেন । পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনা, মাতার সম্পত্তির দেখাশুনা, রক্ষনাবেক্ষন, জুম চাষ কৌশল ইত্যাদি তিনি মাতার গৃহেই শিক্ষা পেয়ে থাকেন । বিবাহের পর বৈবাহিক সূত্রে খাসিয়া পুরুষ স্ত্রীর বাড়ীতে বসবাসের জন্য আসেন । সেখানে স্ত্রীর সম্পত্তির দেখাশোনা, পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করা , বাগানের কাজে অংশ নেয়া, অনেক সময় পরিবারের জন্য রান্না এবং ছোট শিশুদের দেখাশোনা ও খাসিয়া পুরুষ করে থাকেন।

খাসিয়া শিশুরা প্রানবন্ত এবং হাসিখুশী হয়ে থাকে । তারা খুবই বিনয়ী ও ভদ্র হয়ে থাকে । পরিবারের কিশোর- কিশোরীরাও পরিবারেব বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে থাকে । ছোট ভাই-বোনদের দেখা শোনা, ছোট শিশুদের পরিচর্যা ইত্যাদি কাজে তারা পিতা মাতাকে সহায়তা করে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সচরাচর সুখেরই হয়ে থাকে । তবে স্ত্রীর অত্যাধিক কর্তৃত্ব পরায়নতা এবং স্বামীর পরকীয়া প্রেম অনেক সময়-ই বিবাহ বিচ্ছেদের পরিনতি লাভ করে । সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারা একে অপরের মতামত গ্রহন করে । অবসর সময়ে নিজেরা গল্পগুজব করে । খাবারও একত্রেই গ্রহন করে । বিশেষ দিনে বা উপলক্ষে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকে ।

বর্তমানে খাসিয়ারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে শুরু করেছে । প্রায়ই তারা এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতেই লেখাপড়া শুরু ও সমাপ্ত করে থাকে । অধুনা তারা ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রতি অগ্রহী হয়ে উঠছে । আট দশ বৎসর বয়সেই শিশুরা মাতা ও পিতার দেখাদেখি কাজকর্মে অগ্রহী হয়ে উঠে । পারিবারিক পানের ব্যবসার কলাকৌশল, পান জন্মানো, গোছানো এবং বাজারজাতকরন এসকল প্রক্রিয়া ছোট কাল থেকেই তারা শিখে থাকে । এভাবে আয়ের পথ খুঁজে পায় বলেই তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে । তাছাড়া খাসিয়াদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও এভাষার প্রয়োজনীয় বই - পুস্তক তারা পায় না । কোন বিদ্যালয়ও নেই যেখানে নিজস্ব ভাষায় তারা শিক্ষা লাভ করতে পারে । বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বাংলা কিন্তু এর উপর দক্ষতা না থাকায় পরিবারের অন্যান্যদের নিকট থেকেও তারা প্রয়োজনীয় সাহায্য পায় না । ফলে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের পড়াশোনার অধ্যয়ন তারা ত্যাগ করে । এভাবে পারিবারিক ব্যবসায় পরবর্তীতে তারা মনোনিবেশ করে এবং নিজের আয়ের পথ বেছে করে নেয় । আঠার থেকে বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে যুবক-যুবতীদের নিজস্ব মতামত ও স্বাধীন স্বত্ত্ব-বিকশিত হয় এবং সংসার জীবনের পথে তারা পা বাড়ায় ।

গোত্র (Clan): অনেক প্রাচীন নৃগোষ্ঠীর মত খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ও গোত্রবিভাগ রয়েছে । অসংখ্য গোত্র মিলে খাসিয়া সমাজ একটি বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

(exogamous) ভাতৃসংঘ বা ভাতৃগোষ্ঠী (phraty)। খাসিয়া ভাষায় গোত্রকে বলা হয় কুর (kur)। একই গোত্রে খাসিয়া নারী পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ ।

কে. পি চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৪) খাসি পাহাড়ে বসবাসরত খাসিয়াদের বারটি গোত্রের কথা উল্লেখ করেন । যেমন ঃ

তালিকা – ৬

(১) ইয়াং ব্লাহ *(Iang blah)*

(২) লাং দুহ *(Lyndoh)*

(৩) খার শিলিং *(Khar Shiling)*

(৪) খার হুনাই *(Khar Hunai)*

(৫) খার সগলিয়া *((Khar Soglia)*

(৬) খার ফাম্লাপ *(Khar Phamnap)*

(৭) খার কিন্নেই *(Khar Kynnei)*

(৮) মারবা নিয়াং *(Marba Niang)*

(৯) খার নারবি *(Khar Narni)*

(১০) খার মওফ্লাং *(Khar Mowphlang)*

(১১) খার সাখার *(Khar Sahkhar)*

(১২) খার সিনাটিউ *(Khar Syntiew)*

(চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪ ঃ ১৫৯)

সিলেট জেলার খাসিয়াদের প্রধান ৬টি গোত্র হলো ঃ

(১) সিনতেং *(Synteng)*

(২) পনার *(Pnar)*

Dhaka University Institutional Repository

(৩) উয়ার (War)

(৪) ভই (Bhoi)

(৫) লিং গ্যাম (Lyngam) এবং

(৬) লাংদ্রহ (Lyngdoh)

এছাড়া আর যে সকল গোত্র রয়েছে সেগুলো নিম্নরুপ ঃ

১) খৈরম

২) ডিখার

৩) সুমের

৪) সুচেন

৫) সুপ

৬) পসনেম

৭) সুমও

৮) পলং

৯) মরছিয়াং

১০) লানং

১১) তংপের

১২) পতাম

১৩) পেড়ু

১৪) পরমেন

১৫) মানার

১৬) খংলা

১৭) লামারেই

১৮) খারে

Dhaka University Institutional Repository

১৯) *কংওয়া*

২০) *ইয়াংতি*

২১) *লংড*

২২) *সুয়ের*

২৩) *সুচিয়াং*

২৪) *ইয়াং ইউং*

২৫) *রম্ভাই*

২৬) *সাতেং*

২৭) *নংটাড্রু*

২৮) *লমুরং*

২৯) *নাইয়াং*

৩০) *লতুবের*

৩১) *খারজিয়াং*

এই গোত্রগুলো বহির্বিবাহ গোষ্ঠী (exogamous clan)।

খাসিয়া সমাজে গোত্রের ভূমিকা ঃ

ক) খাসিয়া নৃগোষ্ঠীতে বিশেষ বিশেষ গোত্র থেকে গোত্র প্রধান নির্বাচন করা হয়। যাদের সমাজে আলাদা মর্যাদা রয়েছে। আবার প্রত্যেক গোত্রই তাদের সর্দার বা মাতব্বর নির্বাচন করে এবং একটি দরবার বা *দলই* বা পঞ্চায়েত গঠন করে এবং তাদের প্রতিনিধি (যাকে তারা মন্ত্রী নামে অভিহিত করে) নির্বাচন করে। খাসিয়া দরবারই সমাজে শান্তি- শৃংখলা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

খ) খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মধ্যে কোন পরিবার গোত্রের অনুমতি ছাড়া গোত্রের সম্পত্তি অন্য গোত্রে বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে পারে না ।

গ) সম্পত্তির উত্তরাধিকারের পন্থা গোত্র নির্দেশ করে । খাসিয়া সমাজ মাতৃধারা মূলক বা মাতৃসূত্রীয় বিধায় খাসিয়া সমাজে মেয়েরাই মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে ।

ঘ) খাসিয়া সমাজে প্রত্যেকটি গোত্রের একটি করে চিতাভস্ম রাখার জায়গা বা *মাউবাহ্* আছে । গোত্রের কোন লোক মারা গেলে সৎকারের পর তার চিতাভস্ম গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট আধারে জমা দেয়া হয় । খাসিয়া সমাজ মাতৃ আবাসিক বিধায় বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর বাড়ীতে বসবাসের জন্য চলে আসে। এরুপ স্থলে স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতাভস্ম স্বামীর মাতার বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে নির্দিষ্ট আধারে তার চিতাভস্ম সংরক্ষিত হয়ে থাকে । এভাবে খাসিয়া সমাজে কোনই ব্যক্তিই গোত্রান্তারিত হয় না । তারা যে গোত্রে জন্ম গ্রহন করে মৃত্যুতেও সে গোত্রের অধীন থাকে ।

বিবাহ ঃ বিয়ের ক্ষেত্রে খাসিয়ারা তাদের অতি প্রাচীন প্রথাই অনুষ্ঠান করে থাকে । ছেলেমেয়েরা সাবালক হবার পর তাদের সমাজে বিয়ে দেয়া হয় । বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অধিক বয়সী হয় এবং বয়সের এই পার্থক্য হয় সাধারণতঃ ৭ থেকে ৮ বৎসর। সচরাচর ১৮ থেকে ২০ বৎসর বয়সের ছেলেদের সাথে ২৫ থেকে ২৬ বৎসর বয়সের মেয়েদের বিবাহ দেয়া হয় ।

খাসিয়ারা বিয়ের পূর্বে ছেলেমেয়েদের মেলামেশাকে অনুমোদন করে। তারা সমগোত্রে বিয়ে করে না । এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমগোত্রে বিবাহের মত পাপ খাসিয়া সমাজে আর কিছু নেই । বিয়ের পূর্বে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক অনেকদুর গড়ালেই কেবলমাত্র তাদের বাবা-মা হস্তক্ষেপ করে থাকে । অর্থাৎ প্রেম ঘটিত বিয়ের চূড়ান্ত পর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পিতা ও মাতা সম্পন্ন করে থাকেন। বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপনের পর ছেলের পিতা-মাতা মেয়ের পিতা-মাতার কাছে লোক মারফত বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজনের অনুরোধ জানায়। বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হলে তারা *ডিম-ভাঙ্গা* অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিয়ের শুভ-অশুভ ফলাফল পরীক্ষা করে দেখে। *ডিম-ভাঙ্গা* অনুষ্ঠান থেকে অনুকুল ফলাফল পেলেই কেবলমাত্র তারা পরবর্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যদি পরিষ্কার ও উজ্জ্বল অবস্থা ডিমে পরিলক্ষিত হয় তবে বিয়ের দিন ধার্য্য করা হয়। খাসিয়ারা জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে সকল অনুষ্ঠানাদিতেই এই *ডিম-ভাঙ্গা* অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর শুভ-অশুভ ফলাফল নির্ধারণ করে। সংক্ষেপে *ডিম-ভাঙ্গা* অনুষ্ঠানটি নিম্নরুপ ঃ

ডিম-ভাঙ্গা ঃ অনুষ্ঠানটির প্রথমেই ডিম ভাঙ্গার জন্য একটি ছক এঁকে নেয়া হয়। ছকটির মাঝখানে কিছু চাল (rice) দিয়ে ডিমটি বসানোর জায়গা করে নেয়া হয়। যিনি ডিম ভাংগেন তিনি (*থামান*) এই ছকটির দিকে মুখ করে বসেন। এর পর ডিমটির মধ্যে লালমাটির প্রলেপ মাখান এবং মন্ত্র পাঠ করে ছকটির মাঝখানে রেখে দেয়া চালগুলোকে সমস্ত ছকটির উপর বিছিয়ে দেন। তারপর যথেষ্ট জোরের সাথে ডিমটি তিনি ভেঙে ফেলেন এমন ভাবে যেন ডিমের খোসার বড় অংশটি ছকটির ঠিক মাঝখানে পড়ে। খোসার এই বড় অংশটিকে একটি নৌকা মনে করা হয়। ডিমের খোসার বাকী অংশগুলো বড় খোসাটির চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছোট ছোট ডিমের খোসার টুকরাগুলোর অবস্থান দেখেই কোন ঘটনার ভাল বা মন্দ নির্ধারণ করা হয়। যদি খোসার ছোট অংশগুলি বড় খোসার (সেটাকে নৌকার সাথে তুলনা করা হয়) ডান দিকে পড়ে এবং খোসার গর্তযুক্ত অংশটি মাটির দিকে থাকে তবে ফল ভাল বলে ধরে নেয়া হয় কিন্তু যদি খোসার গর্তযুক্ত অংশটি উপরের দিকে থাকে তবে এটা অশুভ লক্ষন। এভাবে ডিম ভাংগার ছকটির চারিপাশে বিভিন্ন স্থানে খোসাগুলির অবস্থান নানারুপ ফল প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে সবক্ষেত্রেই খোসাগুলির ভিতরের গর্তযুক্ত অংশটি মাটির দিকে থাকলে ফল ভালো বলে ধরে নেয়া হয় ।

এভাবে *ডিম ভাংগা* অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে যদি বিয়ের পক্ষে অনুকুল অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তবে বিয়ের দিন ধার্য্য করা হয় । বিয়ের দিন কনেপক্ষের ও বরপক্ষের দুই জন মুরব্বী স্থানীয় লোককে পরিচালক বা *উক-সিয়াং* নিযুক্ত করা হয় । এই *উক-সিয়াংই* আসলে বিয়ের সকল কার্য সমাধা করে । বিয়ে পড়ানোর পূর্বে উক-সিয়াং বরের হাত ধরে কনের মামা কিংবা পিতার হাতে বরকে অর্পন করে । অতঃপর বর ও কনেকে পাশাপাশি বসানো হয় । দুটো সুপারির থলে উক-সিয়াং বর ও কনের হাতে দেন । (খ্রীষ্টান হলে স্বর্ন বা রৌপ্যের আংটি দেয়া হয়) বর ও কনে তখন পরস্পরের মধ্যে এই থলে বদল করে । এটা তাদের বিয়ের স্বীকারোক্তিমূলক অনুষ্ঠান । অতঃপর *উক-সিয়াং* বিয়ের মন্ত্র পাঠ করে বিয়ের কাজ সমাধা করে । অতঃপর নিমন্ত্রিত দুই পক্ষের লোকদের মধ্যে বিয়ের জন্য আয়োজিত ভোজ এবং মদ পরিবেশন করা হয় ।

খাসিয়া সমাজে বিবাহ প্রথার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঃ

খাসিয়া সমাজের একটি সাধারন নিয়ম হলো গোত্রের বাইরে বিবাহ করা । এ প্রথাকে বলা হয় বর্হিগোত্র বিবাহ প্রথা বা exnogamy । স্বগোত্রে বিবাহ করা যায় না - এই বিধি নিষেধ (taboo) হলো বহির্গোত্র বিবাহের ভিত্তি ।

খাসিয়া সমাজে এক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই (monogamy) দেখা যায় । স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে পুনরায় তারা অন্য নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে পারে । তবে মৃত্যুর এক বৎসর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হয় । নিষেধাজ্ঞা না মানলে তাকে

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট জরিমানা দিয়ে স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যুর নিষেধাজ্ঞা (taboo) উঠিয়ে নিতে হয়। খাসিয়া সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের রীতি থাকায় তালাক দেবার পর স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় অন্য নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে পারে।

খাসিয়াদের মধ্যে বহু স্ত্রী বিবাহ (polygyny) বা বহু স্বামী বিবাহের (polyandry) প্রচলন নেই।

খাসিয়া সমাজে লেভিরেট (levirate) প্রথা অর্থাৎ যে প্রথায় এক ব্যক্তি তার ভাই এর মৃত্যুর পর ভাই এর স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং সরোরেট (sororate) যে প্রথায় ব্যক্তি মৃত স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে বাধ্য থাকে এর কোনটিরই প্রচলন নেই।

খাসিয়া পুরুষেরা বিবাহের পর স্ত্রীর মায়ের বাড়ীতে চলে আসে এবং একটি বা দুটি সন্তানের জন্মের পর নিজেরা আলাদা বাড়ী তৈরী করে বসবাস শুরু করে।

একজন খাসিয়া পুরুষ তার কাকাতো বোনকে অর্থাৎ পিতার ভাই এর মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না। যত দিন পিতা জীবিত থাকেন ততদিন পিতার বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যায়।

খাসিয়া পুরুষ তার মামার জীবিতাবস্থায় মামাতো বোনকে বিয়ে করতে পারে না, তবে মামার মৃত্যুর পর পারে। খাসিয়া সমাজে এ সকল বিধিবিধানগুলো বিবাহের সময় মেনে চলা হয়। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পূর্বে এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করা তাদের দৃষ্টিতে পাপ হিসাবে গন্য করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া নারীদের ও বিবাহের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় যেমন, একজন খাসিয়া মহিলা তার পিতার ভাইয়ের ছেলেকে বিয়ে করতে পারে না বা পিতার জীবিতাবস্থায় তার বোনের ছেলেকে বিয়ে করতে পারে না । কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরে পারে ।

একজন খাসিয়া মহিলা তার মাতার ভাইয়ের ছেলেকে বিয়ে করতে পারে না এমনকি মামার মৃত্যুর পরও পারে না । কোন বিধবার কন্যা সন্তান থাকলে সে আর সাধারণত পুনরায় বিবাহ করে না ।

যে কোন খাসিয়া পরিবারই বিবাহের পূর্বে এসব বিধি নিষেধ যাচাই করে তাবে বিয়ের কাজে অগ্রসর হয় ।

বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce) ঃ খাসিয়া সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ বহুল প্রচলিত একটি সামাজিক ঘটনা । নানা কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। যথা- স্বামী বা স্ত্রী অন্য কোন স্ত্রী বা পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করলে (adultery) । স্বামী যদি পর্যাপ্ত কাজকর্ম (যেমন ঃ বাগানে চারা গাছ জন্মানো, গাছের পরিচর্যা, পারিবারিক পশুপাখি দেখাশুনার অসমর্থতা) না করতে পারে অর্থাৎ অকেজো বলে বিবেচিত হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই যদি মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে প্রতিনিয়ত ঝগড়া বিবাদ এমনকি যা মারামারি পর্যন্ত গড়ায় এমন অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্ন উঠে । বিবাহ বিচ্ছেদ অনুষ্ঠানটি নিম্নরুপ ঃ

সাধারণতঃ মামা এবং *উক্-সিয়াং* (বিয়ের পরিচালক) এর উপস্থিতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুষ্ঠানটি ঘটে থাকে । তবে যে সব বিয়েতে *উক্-সিয়াং* উপস্থিত থাকেন না , বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও তার উপস্থিত থাকার দরকার নেই । এসব ক্ষেত্রে দুই পক্ষের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতিই যথেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় । সাধারণতঃ খোলা জায়গায় (ঘরের ভিতরে নয়) অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় । স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই পাঁচটি করে কড়ি (সমুদ্রে জন্মে ছোট শামুকের খোসার মত যা পূর্বে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল) বা এর অভাবে টাকা বা পয়সা নিয়ে আসে । স্ত্রী তখন তার পাঁচটি কড়ি বা পয়সা স্বামীর হাতে দেয়, স্বামী তার নিজের পাঁচটি সহ পুনরায় ১০টি কড়ি বা পয়সা স্ত্রীর

Dhaka University Institutional Repository

হাতে ফিরিয়ে দেয় । স্ত্রী পুনরায় ১০টি কড়ি বা পয়সা স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিলে স্বামী তা মাটিতে নিক্ষেপ করে । এরপর সারা গ্রামে চিৎকার করে এই তালাকের ঘটনা জানিয়ে দেয়া হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ সংগঠিত হয়ে গেলে স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় আলাদা বিবাহ করতে পারে তবে প্রাক্তন স্ত্রী বা স্বামীর পরিবারে নয় । গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেবার রীতি খাসিয়া সমাজে নেই । স্ত্রী গর্ভবতী হলে এই সময়ে তাকে তালাক দেয়া যায় না ।

জ্ঞাতিসম্পর্ক (Kinship) ঃ সামাজিক সংগঠনের মূলে কাজ করে জ্ঞাতি সম্পর্ক। বিভিন্ন সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্ক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারনা রয়েছে । কোন সমাজ জ্ঞাতি সম্পর্ক বাতিল বলেও গন্য করতে পারে আবার কৃত্রিম আত্মীয়তার সূত্রপাত করতে পারে । তিনভাবে এই সম্পর্ক নিরুপিত হয় । যথা ঃ

(১) জৈবিক (বংশগত) বা রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন (ties of biological ancestry or consanguinity),

(২) বৈবাহিক বন্ধন (ties of marriage or affinity) ও

(৩) কাল্পনিক বন্ধন (fictional ties).

খাসিয়া সমাজেরও জ্ঞাতি সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম । তাদের সমাজে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন সামাজিক ঐক্য রক্ষার অন্যতম উপাদান । জ্ঞাতিসম্পর্ক দ্বারা রচিত কাঠামোর মধ্যেই ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় । ব্যক্তি অধিকার ভোগ করে ও দায়িত্ব পালন করে এবং কৌমের সাহায্য পায় । খাসিয়া সমাজে দুভাবে জ্ঞাতিসম্পর্ক নিরুপিত হয়ে থাকে । যথা ঃ

(১) **জৈবিক (বংশগত) বা রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন ঃ** খাসিয়া জ্ঞাতি সম্পর্কের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম ভিত্তি হলো জৈবিক(বংশগত) বন্ধন বা রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন। তাদের সমাজে একজন ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, নাতী-নাতনীর সংগে রক্ত সম্পর্কিত বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত।

(২) **বৈবাহিক বন্ধন ঃ** বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে খাসিয়া সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন খাসিয়া মহিলা বা পুরুষ তাদের শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর পক্ষের জ্ঞাতিদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। খাসিয়া সমাজে কোন স্বামীর স্ত্রী প্রায় ক্ষেত্রেই বৈবাহিক বন্ধনের জ্ঞাতি, রক্ত সম্পর্ক সূত্রে জ্ঞাতি নয়।

খাসিয়াদের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধন খুবই শক্তিশালী। গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই যেনো এই জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা আত্মীয় -স্বজন মিলে একত্রে বসবাস করে, একত্রে কাজ করে এবং একে অপরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা ঃ

শিশুর জন্ম ঃ কোনো পরিবারে খাসিয়া শিশুর জন্মের সময় গর্ভবতী মাতা পুরোপুরিই আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শিশুর জন্মের সময় ঝুঁকিপূর্ণ মূহুর্তে নিকট আত্মীয়রাই প্রসূতি মাতার সকল কষ্ট মোচন করে এবং সন্তানের জন্ম মূহুর্তের আনুষ্ঠানিকতাগুলো সম্পন্ন করে। শিশুর নাম রাখার পূর্বে পর্যন্ত অর্থাৎ জন্মের পরে সন্তানের পিতাই শিশুর গর্ভফুলসহ মাটির পাত্রটি (যা কিনা জন্মের পর পরই একটি মাটির পাত্রে রেখে দেয়া) গ্রামের বাইরে কোন গাছে ঝুলিয়ে রেখে আসে। এটি খাসিয়া সমাজের একটি বিশেষ রীতি।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের সময় ঃ যদিও খাসিয়া সমাজে বিবাহের পূর্বে ছেলেমেয়েদের মেলামেশাকে অনুমোদন করে তথাপি বিয়ের চূড়ান্ত অনুষ্ঠানটি আত্মীয় এবং নিকট জ্ঞাতিরাই সম্পন্ন করে থাকে । বিশেষ করে এক্ষেত্রে কনের মামার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মূলত ঃ তিনিই কনের বাড়ীর প্রকৃত অভিভাবক রুপে কাজ করেন । বিয়েব জন্য যে ভোজের আয়োজন করা হয় , কনের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরাই তার ব্যয়ভার এবং প্রস্তুতির ব্যবস্থা করে। বিবাহেব পর বর কনেব থাকার স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং পরবর্তীতে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থাও নিকট জ্ঞাতিরাই করে থাকেন।

আর্থিক সংকটের সময় ঃ

কোন খাসিয়া পরিবার হঠাৎ করে আর্থিক সংকটে পড়লে তার নিকট জ্ঞাতির বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। অথবা একক ভাবেও কোন জ্ঞাতি অর্থকষ্টে পতিত হলে জ্ঞাতিরাই তাকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সহায়তা করে ।

মৃত্যু পরবর্তী অনুষ্ঠানাদিতে ঃ খাসিয়া সমাজে মৃত্যুর পর বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর মৃত ব্যক্তিকে পোড়ানো হয় । তবে খাসিয়াদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছে তারা মৃতদেহ কবর দিয়ে থাকে । যারা খাসিয়া ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে তারা মৃতদেহ পুড়িয়ে থাকে এবং এই মৃতের সৎকার বা দাহ অনুষ্ঠানে আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী মোরগ অথবা ছাগল উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। এই ক্রিয়া কর্ম গুলি মৃত ব্যক্তির আত্মীয় এবং জ্ঞাতিদের দ্বারাই সম্পন্ন হয় ।(খাসিয়া শবদাহ অনুষ্ঠানটি " আচার অনুষ্ঠান " নামক অংশে আলোচনা করা হয়েছে)

খাসিয়াদের জ্ঞাতিসম্পর্কের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

একজন খাসিয়া শিশু তার বড় ভাইকে ***বাহ্*** এবং ছোট ভাইকে ***উ-হেপ***, বড় বোনকে ***কং***, ছোট বোনকে ***কা-হেপ***, পিতাকে ***পা***, মাতাকে ***মেই*** বা ***ভেই*** রুপে সম্বোধন করে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া জ্ঞাতি সম্পর্ক বর্ননা মূলক (descriptive) । যেমন, পিতা, মাতা, ভাইবোন, চাচা, চাচী, মামা, মামী, এদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে তারা পৃথক সম্বোধন পদ ব্যবহার করে থাকে ।

ভাইবোনদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনুযায়ী অর্থাৎ সম্বোধনকারীর থেকে বয়সে বড় বা ছোট হলে সম্বোধন পদ ভিন্ন হয় । এই পার্থক্য সম্বোধনকারীর পিতা মাতার ভাইবোনদের সম্বোধন করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । যেমন কোন খাসিয়া তার মাতার বড়বোনকে সম্বোধন *করে কা-মেই-সান* এবং মাতার ছোট বোনকে সম্বোধন করে *কা-মেই-নাহ্* । এভাবে একই ধরনের আত্মীয়ের ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্য অনুযায়ী সম্বোধন পদে বিভিন্নতা দেখা যায় ।

একজন খাসিয়া রমনী তার বোনের ছেলে মেয়েদের যেভাবে সম্বোধন করে একজন খাসিয়া পুরুষ তার ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের ঠিক সেভাবেই সম্বোধন করে । কিন্তু একজন খাসিয়া মহিলা তার ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে ভিন্ন সম্বোধন পদ ব্যবহার করে যা কিনা তার ভাই তার ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে ।

কিছু জ্ঞাতিকে খাসিয়ারা দলীয়ভাবে একই সম্বোধন পদ ব্যবহার করে । যেমনঃ সৎ-মাতা, মাতা, মাতার বোন, পিতার ভাইয়ের স্ত্রী, এরা সকলে একইভাবে সম্বোধিত হয় । ঠিক একই ভাবে পিতা, সৎ-পিতা, পিতার ভাই, এবং মাতার বোনের স্বামীর ক্ষেত্রে একই সম্বোধন পদ ব্যবহার করা হয় । এক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে , পিতা বা মাতাকে যেভাবে সম্বোধন করা হয়, বাকী জ্ঞাতিদের ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্য অনুসারে একটি বিশেষ পদ শেষে যোগ করে সেভাবে সম্বোধন করা হয় । মাতার ভাই এবং পিতার বোনের স্বামীদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, মাতার ভাইদের যেভাবে বয়সের তারতম্য অনুযায়ী ভিন্ন সম্বোধন পদ ব্যবহার করে সম্বোধন করা হয়, পিতার ভাইদের ক্ষেত্রে এতটা গুরুত্ব দিয়ে বয়সের তারতম্য বিচার করা হয় না ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে খাসিয়া সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

তালিকা - ৭

জ্ঞাতি সম্পর্কের তালিকা

আত্মীয়তা সম্পর্ক	সম্বোধন সূচক শব্দ (Terms of Address)
পিতা	*পা*
মাতা	*মেই/ভেই*
দাদা	*হেপ/ওয়া*
দাদী	*ওয়া*
পুত্র	*খন*
কন্যা	*খন*
মাতার বোড় বোন	*মেই সান*
মাতার ছোটি বোন	*মেই নাহ্*
ছোটি বোনের কন্যা	*খন রুইট*
বড় বোনের কন্যা	*খন রুইট*
মাতার বড় ভাই	*মা র‍্যাংবা*
মাতার ছোটি ভাই	*মা খিন্না*
ছোটি বোনের পুত্র	*পরছা*
ছোটি বোনের কন্যা	*পরছা*
মাতার বড় ভাইয়ের স্ত্রী	*নিয়া*
মাতার বড় বোনের স্বামী	*পা-সান*
মাতার পিতা	*পরাদ/পা হেপ*
মাতার মাতা	*মেই হেপ*
মাতার বোনের পুত্র	*বাহ্*
মাতার বোনের কন্যা(বড়)	*কা- কং*
মাতার বোনের কন্যা (ছোটি)	*কা হেপ*
মাতার ভাইয়ের পুত্র (বড়)	*বাহ্*

Dhaka University Institutional Repository

মাতার ভাইয়ের পুত্র (ছোট)	হেপ
মাতার ভাইয়ের কন্যা (বড়)	কং
মাতার ভাইয়ের কন্যা (ছোট)	হেপ
মাতার ছোট বোনের স্বামী	পা খিল্লা
পিতার বড় ভাই	পা সান
পিতার ছোট ভাই	পা খিল্লা
পিতার বড় ভাইয়ের স্ত্রী	মেই সান
পিতার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী	মেই নাহ
পিতার বড় বোন	আই নিয়া খা
পিতা ছোট বোন	আই নিয়া খা
পিতার বোনের স্বামী	মা
পিতার বোনের পুত্র (বড়)	বাহ্
পিতার বোনের পুত্র (ছোট)	হেপ
পিতার বোনের কন্যা (বড়)	কং
পিতার বোনের কন্যা (ছোট)	হেপ
পিতার ভাইয়ের পুত্র (বড)	বাহ্
পিতার ভাইয়ের পুত্র (ছোট)	হেপ
পিতার ভাইয়ের কন্যা (বড়)	কং
পিতার ভাইয়ের কন্যা (ছোট)	হেপ
পিতার পিতা	পরাদ/পা হেপ
পিতার মাতা	ক-মেই খা
স্ত্রী	ইকমি কি খন
স্বামী	বাহ্
বড় ভাই	খং
বড় বোন	হেপ
ছোট ভাই	হেপ
ছোট বোন	কা-হেপ
স্ত্রীর বড় বোন	কা-কং

Dhaka University Institutional Repository

বড় বোনের স্বামী	উ-কং
ছোট বোনের স্বামী	কং
স্ত্রীর ভাই	উ-উন
স্ত্রীব ছোট ভাইয়ের স্ত্রী	ক- হেপ
স্ত্রীর বড় বোনের স্বামী	উ- কং
স্ত্রীর ছোট বোনের স্বামী	উ-হেপ
স্ত্রীর মাতা	কা -কিয়াও
স্ত্রীর পিতা	উথ- কথাউ
স্বামীর বড় বোনের স্বামী	আই- কং
স্বামীর ছোট বোনের স্বামী	উ-হেপ
স্বামীর ছোট ভাই	উ-হেপ
স্বামীর মাতা	কা-কিয়াও
স্বামীর পিতা	উ-কথাউ
পুত্রের স্ত্রী	কা-পরছা
কন্যাব স্বামী	উ-পরছা
কন্যার স্বামীর মাতা	কা-হেপ
পুত্রের স্ত্রীব মাতা	কা-নেই-রাদ
কন্যার পুত্র	খন-ইকসিউ
কন্যার কন্যা	খন-ইকসিউ
পুত্রের পুত্র	খন-ইকসিউ
পুত্রের কন্যা	খন-ইকসিউ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনৈতিক সংগঠন

সমাজ জীবনের শুরু থেকেই মানুষকে খাদ্যের সংস্থান করতে হয়েছে । জীবন ধারণ এবং মৌল মানবিক প্রয়োজন পূরনের তাগিদে মানুষ আবিস্কার করেছে নানাবিধ প্রযুক্তি ও কলাকৌশল । মানুষের প্রয়োজন পূরনের কলাকৌশল উদ্ভাবনকে প্রভাবিত করেছে প্রকৃতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন উপাদান (factor) । যেমনঃ ভূমির প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, মূল্যবোধ, সমাজভেদে রীতি-নীতি, প্রাপ্ত সম্পদ ইত্যাদি । খাসিয়া নৃগোষ্ঠী একটি অতি প্রাচীন নৃগোষ্ঠী বিধায় তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কর্মকান্ডের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য যা স্বতন্ত্র বিশ্লেষনের দাবী রাখে । সেকারনে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডগুলো তারা যেভাবে পরিচালনা করে ঠিক সেভাবে ব্যাখ্যা করাই যুক্তিযুক্ত ।

খাসিয়ারা পার্বত্য এলাকায় স্মরনাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে । সেকারনে পার্বত্য বনভূমি তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে । তাই খাসিয়াদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কর্মকান্ড বন-সম্পদ নির্ভর সরল প্রযুক্তি সম্পন্ন । বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তারা পার্বত্য এলাকায় উৎপাদন করে এবং নানা প্রকার বনজ সম্পদকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে । পান উৎপাদন ও বিক্রয় সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যতম তবে সাম্প্রতিক সময়ে এলাকার বৃহত্তর বাঙ্গালী জন সাধারনের সাথে তাদের মেলামেশা এবং আর্থ-সামাজিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের জন্য নতুন এমন কিছু পেশাতেও তারা যোগ দিতে শুরু করেছে । যথাঃ হাসপাতালের আয়ার কাজ, টেলিফোন অপারেটরের কাজ, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়াদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডগুলোকে নিম্নলিখিত রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

ক। প্রধান বা মূল পেশা ঃ

১) জুম চাষ

২) পান চাষ ও পানের ব্যবসা

৩) আলু চাষ

৪) সুপারী উৎপাদন ও বিক্রয়

৫) পাহাড় সংলগ্ন সমতল ভূমির চাষাবাদ

খ। জীবিকা নির্বাহের সহায়ক কার্যক্রম ঃ

১) তেজপাতা সংগ্রহ ও বিক্রয়

২) ফলমূল সংগ্রহ ও বিক্রয়

৩) কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়

৪) পশু-পাখি পালন

৫) মদ তৈরী ও বিক্রয়

৬) মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ ।

প্রধান বা মূল পেশা ঃ কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের মধ্যে পান চাষেই সিলেট জেলার খাসিয়ারা সর্বাধিক জড়িত । পান খাসিয়াদের জন্য তাই একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল (cash crop)। পান উৎপাদন এবং বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসাই সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মূল পেশা ।

জুম চাষ ঃ খাসিয়াদের কৃষিজ উৎপাদনে জুম চাষ পদ্ধতি অন্যতম স্থান অধিকার করে রয়েছে । এই পদ্ধতিতে যে কৌশলে তারা বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন করে থাকে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

জুমের জন্য জমি নির্বাচন ঃ জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য জমি নির্বাচন করাই খাসিয়াদের প্রথম কাজ। সিলেট জেলার তামাবিল সীমান্তের কাছাকাছি যে ছোট ছোট টিলাগুলো দেখা যায় এর আশপাশেই খাসিয়াদের বসতি রয়েছে বলে এই অঞ্চলের টিলাগুলোতেই (ছোট পাহাড়) তারা জুম পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফসলাদিসহ পান উৎপাদন করে থাকে । যে টিলা বা ছোট পাহাড় তারা জুমের জন্য নির্বাচন করে সেগুলো সাধারনত সরকারের বনবিভাগ থেকে লিজ নিয়ে থাকে । জুমের জন্য জমি নির্বাচনের সময় তারা কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে । যথাঃ পাহাড় বা টিলার যেসব অংশে গাছপালা বেশী এবং ঘন সেসব জমিই তারা জুমের জন্য নির্বাচন করে থাকে । বেশী এবং বড় বড় গাছ পালা সম্পন্ন জমি নির্বাচনের অর্থ হলো, দীর্ঘদিন ধরে অনাবাদি থাকায় এসব জমির উর্বরতা বেশী বলে ধরে নেওয়া হয় ।

এসব বনজঙ্গল ও গাছ পালা পুড়িয়ে যে ছাইভস্ম পাওয়া যায় সেগুলোও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে । এসব কারনেই সাধারণত খাসিয়ারা ঘন বনজঙ্গল ও গাছ পালা বেষ্টিত জমি জুমের জন্য নির্বাচন করে ।

চাষ পদ্ধতি ঃ জমি নির্বাচন সম্পন্ন হলে ফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে খাসিয়ারা জমির ছোট ছোট গাছ পালাগুলো কেটে দেয় । তবে শাল জাতীয় বড় বড় বৃক্ষগুলোর শুধুমাত্র ডাল পালা ছেঁটে দেয়া হয় । মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে কেটে ফেলা গাছপালাগুলো শুকিয়ে যায় । খাসিয়ারা তখন এসব শুকনো ঝোপ-ঝাড় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি নামার পূর্বেই তারা এ পর্ব সমাধা করে । পুড়ে যাওয়া ছাই ভস্ম জমিতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এবং বৃষ্টি নামলে এগুলো ভিজে নরম সারে পরিনত হয়। জমি নরম হলে জুলাই মাসে খাসিয়ারা জুমের জন্য নির্বাচিত ফসলের চারা বা বীজ সেখানে রোপন করে । এই পদ্ধতিতে তারা আনারস, ভূট্টা, আদা, হলুদ, কমলা কলা, সুপারী, আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদির চাষ করে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

পান চাষ ঃ জুমের জন্য নির্বাচিত জমির ছোট ছোট গাছ পালা ও জঙ্গল কেটে ফেলা হলেও শাল জাতীয় বড় বড় বৃক্ষগুলোর শুধুমাত্র ডালপালা ছেঁটে দেয়া হয়। কারণ এ সকল বৃক্ষের গোড়াতেই খাসিয়ারা পানের চারা রোপন করে। পান লতা জাতীয় উদ্ভিদ বিধায় সহজে এসব গাছ বেয়ে উপরে উঠে যায় এবং ডাল পালা বিস্তার করে। পানের চারা যেখানে লাগানো হয় সে স্থানকে খাসিয়ারা *ইয়ুং পথি* নামে চিহ্নিত করে। বৎসরে তিনবার তারা বাগানের আগাছা পরিষ্কার করে। আগাছা পরিষ্কারের এই কাজকে বলা হয় *খি-ব্রি*। পুরুষেরা বড় বড় গাছ কাটা, গাছের উপরের ডালপালা ছাঁটাই, জঙ্গল পোড়ানো, বীজবপন, চারা রোপন, ইত্যাদি কাজগুলো করে থাকে। সারাবর্ষ ব্যাপী এই দীর্ঘ চাষাবাদ পদ্ধতি খুবই শ্রমসাধ্য। খাসিয়ারা নারী পুরুষ উভয়েই এজন্য প্রচুর পরিশ্রম করে থাকে।

পানের ব্যবসা ঃ সিলেট অঞ্চলের খাসিয়াদের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে পানের ব্যবসা। বাগানে পানের পাতাগুলো বড় হলে সেগুলো তুলে আনা হয়। বাগান থেকে পান বা সুপারী তুলে আনার কাজে খাসিয়া নারী পুরুষ উভয়েই অংশ নিয়ে থাকে। পান ও সুপারি সংগ্রহের কাজে খাসিয়ারা এক ধরনের বেত বা বাঁশের তৈরী ঝুড়ি (*থাবা / খারা*) ব্যবহার করে থাকে। একটি লম্বা ফিতা (*উজার*) দিয়ে এই ঝুড়ি (basket) তারা মাথার সাথে লাগিয়ে পিঠে বহন করে। বাগান থেকে পান তুলে আনার পর সেগুলো গুছিয়ে নেবার কাজ খাসিয়া মেয়েরাই করে থাকে। প্রথমে তারা পান গুলো *মুঠার* হিসাবে বেঁধে নেয়। এজন্য তারা সুপারি গাছের পাতার নীচের শক্ত খোলার মত অংশটিকে চিরে সরু ফিতার আকারে ব্যবহার করে থাকে। *মুঠা* করে বেঁধে তারা পানগুলো বিক্রয়ের জন্য *থাবায়* (ঝুড়ি) সাজিয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যায় অথবা বাড়ির সামনে বারান্দায় (*খারি*) সাজিয়ে রাখে। প্রায় সময়েই স্থানীয় ক্রেতারা সেখান থেকেই এগুলো কিনে নিয়ে যায়। পান বিক্রি হয় *মুঠা*, *মুড়া* এবং *থাবার* হিসাবে।

১ *মুঠা* = ২৫ টি পান

৪ *মুঠা* = ১ *মুড়া*

৪০ মুড়া = ১ *থাবা*।

১ (এক) মুঠা পানের মূল্য বর্ষা-মৌসুমে ৮/- থেকে ১০/- টাকা এবং শীত-মৌসুমে ৮০/- থেকে ১০০/- টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আলু (*ছ-লাহ্*) চাষ ঃ খাসিয়ারা জুমের জন্য নির্বাচিত জমির বেশ কিছু অংশে আলুর (মিষ্টি আলু ও গোল আলু) চাষ করে থাকে । জুমের জমি বীজ বপনের জন্য তৈরী হয়ে গেলে আলু বীজ বপন করা হয় । বীজ বপনের কাজ প্রায় সময়েই খাসিয়া মহিলারা করে থাকে । দুই জন খাসিয়া নারী এই কাজে অংশ নেয় ।

প্রথম জন একটি ঝুড়িতে (basket) আলুর বীজ নিয়ে বাঁ হাতে কোলের কাছে ধরে রাখে । ডান হাতে একটি নিড়ানি (*মউ-খিউ-হে*) দিয়ে মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করতে থাকে এবং বাঁ হাতে প্রতি গর্তে দুটি করে আলু বীজ ফেলতে থাকে । গর্তগুলো সাধারণতঃ ৬ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৬ ইঞ্চি গভীর হয়ে থাকে । একটি গর্ত থেকে অপর একটি গর্তের দূরত্ব ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে । অপর খাসিয়া মহিলাটি একটি ঝুড়িতে সার নিয়ে কোলের কাছে ধারণ করে এবং গর্তে বীজ ফেলার সাথে সাথে একমুঠো করে সার তার উপর ছড়িয়ে দিয়ে বীজসহ গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দেয় । সাধারণতঃ শুকনো পাতা পুড়িয়ে বা পচিয়ে ফসলের জন্য সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় । আলুর চারা গজিয়ে ৬ ইঞ্চি পরিমান লম্বা হলে সেগুলো মাটির উপর কিছুটা লতার মত বেড়ে ওঠে । যখন পাতার রং হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন আলু পাকতে শুরু করেছে বলে ধরে নেয়া হয়। অতঃপর এগুলো তুলে এনে খাসিয়ারা খাবারের জন্য ব্যবহার করে এবং উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে বিক্রয় করে অর্থ-সংস্থান করে ।

সুপারি (*কুয়াই/কুই*) উৎপাদন ও বিক্রয় ঃ পান চাষের পাশাপাশি খাসিয়ারা প্রচুর পরিমানে সুপারি (*কুয়াই/কুই*) উৎপাদন ও বিক্রয় করে থাকে । সুপারি চারা রোপনের জন্য তারা পাহাড়ের ঢালে জুম পদ্ধতিতে জমি নির্বাচন করে । আবার খাসিয়াদের বসতবাড়ি সংলগ্ন সে পারিবারিক বাগান থাকে সেখানেও সুপারির চারা রোপন করে । চারা রোপনের পর কয়েকবার আগাছা পরিস্কার করে ও সময় মত পানি দিতে হয়। সাধারণতঃ গাছ বড় হয়ে ফল দিতে দুই থেকে তিন বৎসর সময় লেগে যায় । প্রায় সময়ই দেখা যায় যে খাসিয়ারা সুপারি গাছের নিচে পানের চারা লাগিয়ে দেয় । সুপারি গাছ বেয়ে পান গাছ ডাল পালা বিস্তার করে । একই গাছে পান এবং সুপারির ফলন খাসিয়াদের

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে এক সৌন্দর্য্য মন্ডিত সংযোজন । সুপারি পেকে গেলে সেগুলো গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে আসা হয় । গাছ থেকে সুপারি সংগ্রহ করার কাজটি খাসিয়া পুরুষেরাই করে থাকে । গাছে ওঠার জন্য তারা বিশেষ ধরনের বাঁশের তৈরী মই (*জেং কেইন*) ব্যবহার করে । সুপারি সংগ্রহের জন্য ও তারা পিঠে বিশেষ ধরনের ঝুড়ি (*থাবা*) ব্যবহার করে থাকে । গাছ থেকে নামিয়ে আনার পর ঝুড়ি (*থাবা*) ভর্তি সুপারি খাসিয়া নারী-পুরুষ উভয়েই বহন করে বাড়িতে নিয়ে আসে । খাসিয়ারা প্রচুর পান ও সুপারি নিজেরা খেয়ে থাকে এবং বিক্রয়ও করে । খাসিয়ারা প্রায় সবসময়ই পান সুপারি খায় । অতিথি আপ্যায়নেও তারা পান সুপারি ব্যবহার করে । সুপারি রোদে শুকিয়ে এবং বিশেষভাবে পঁচিয়ে তারা খাবার ও বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করে । মাটির বড় কলসীতে (*কুম*) পানি সহযোগে সুপারি (খোসাসহ) ভিজিয়ে রাখে । দুই থেকে তিনমাস এভাবে রেখে দেবার পর এগুলোর খোসা পঁচে যায় এবং সুপারি গুলো নরম হয়ে আসে। এই পঁচা সুপারি ও তারা খাবার এবং বিক্রয়ের কাজে ব্যবহার করে থাকে ।

<u>সুপারি বিক্রয়ের রীতি</u> ঃ বাংলা অগ্রহায়ন মাসের দিকে সুপারি পেকে হলুদবর্ণ ধারণ করলে সেগুলো তুলে আনার উপযোগী হয় । পাকা সুপারি **ঘা** এবং **বি** এই দুই হিসাবে খাসিয়ারা বিক্রয় করে থাকে ।

১০ টি সুপারি = ১ ঘা (*সিকতি / সিতায়*)

১০০টি সুপারি = ১ বি

উৎপাদন মৌসুমে ১০০টি সুপারি ৬০/- থেকে ৭০/- টাকা দরে এবং অন্য সময় ১০০/- টাকা দরে বিক্রয় করে থাকে ।

<u>পাহাড় সংলগ্ন সমতলভূমির চাষাবাদ</u> ঃ পাহাড় সংলগ্ন সমতলভূমিতে খাসিয়া মালিকানাধীন যেসব জমি রয়েছে সেগুলোতে তারা ধান, ডাল, আলু (মিষ্টি ও গোল আলু) এবং অন্যান্য তরি-তরকারী উৎপাদনের জন্য স্থানীয় বর্গাচাষীদের (খাসিয়া নয়) নিকট বর্গা দিয়ে থাকে । উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পায় বর্গাচাষী এবং অর্ধেক পায় খাসিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি মালিক । কারন সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠী সমতলভূমির চাষাবাদে খুব একটা অভ্যস্ত নয় । আংশিক ভাবে সীমিত পরিমানে ঘরবাড়ি সংলগ্ন সমতল জমিতে তারা বিভিন্ন প্রকারের শাক-সব্জি ও তরিতরকারী উৎপাদন করে থাকে । তবে পাহাড়ের ঢালে জুম পদ্ধতিতে ধান চাষে তারা অভ্যস্ত ছিল । বর্তমানে জুম পদ্ধতিতে ধানের উৎপাদন কম হয় বলে (অধিকাংশ খাসিয়ারাই আবাদযোগ্য জমির পরিমান কম এবং চাষাবাদের জন্য উপযোগী জনবল কম থাকায়) পাহাড়ের ঢালে পান চাষেই সিলেটি জেলার খাসিয়ারা সার্বিক ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ।

বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করার সময় কিছু নিয়ম (প্রবাদ বাক্যের মত) খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে যা তারা মেনে চলে, যেমন ঃ কোন কোন খাসিয়া নারী পুরুষের হাতযশ থাকে না বলে তারা বিশ্বাস করে। সেরকম কারো হাত দিয়ে তারা বীজ বপন করে না । কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, এসব লোকের স্পর্শ কৃষিকাজের জন্য ক্ষতিকর বা অশুভ ।

যখন আকাশে চাঁদের উদয় হয় সে মুহূর্তে কোনো গাছের চারা বা বীজ রোপন করা উচিত নয়। চাঁদ অস্তমিত হয়ে সুর্যোদয়ের মুহূর্তই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। অপরাহ্নের লাল আকাশ পরবর্তী দিনটি শুভ হবে বলে ইঙ্গিত দেয় ।

কৃষিকাজে খাসিয়ারা যেসব হাতিয়ার (agricultural implements) ব্যবহার করে সেগুলো হলো ঃ

১) একটি বড় আকৃতির নিড়ানি (hoe) - *মউ-খিউ-হে*,

২) একটি কুঠার (axe) - *উ-ইচ ডাই*,

৩) একটি বড়া দা - *কা-উয়েত-লিংগাম*,

৪) একটি জমিতে দেবার মই (harrow) *কা-ইয়ু-মই*।

অন্যান্য অর্থকরী ফসলের গাছগুলো (cash crop) যেমন, কমলা, লেবু, জাম্বুরা, গোলমরিচ এবং তেজপাতার গাছগুলোর চারা খাসিয়ারা স্থায়ীভাবে রোপন করে । চারাগুলো বড় হওয়া পর্যন্ত আগাছা পরিষ্কার এবং সময় মত এগুলোর গোড়ায় সার ও পানি দেবার ব্যবস্থা করে থাকে । এসব গাছ বড় হয়ে গেলে আর বিশেষ যত্ন নেবার প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

হয় না । শুধু কীট পতঙ্গের আক্রমন থেকে গাছ এবং পাতা রক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃ গ্রহন করে থাকে ।

তালিকা - ৮

খাসিয়াদের দ্বারা উৎপাদিত কয়েকটি অর্থকরী ফসল ও সব্জির তালিকা

বাংলা শব্দ	খাসিয়া শব্দ
পান	*পথি*
সুপারি	*কুইকুয়াই*
লেবু	*ছ-কাগজি*
কলা	*পে-লা-ডাও*
আনারস	*ছি-ব্রি-এইন*
আলু	*ছ-লাহ্*
ধান	*কুবা*
তেজপাতা	*লা-তরপাদ*
হলুদ	*ছেরমিত*
মরিচ	*সুমারিত*
আদা	*ছিং*
ধনিয়া	*বাখর*
শশা	*সখে*
লাউ	*ছংক্লং*
কুমড়া	*পথ*
সিম	*ত*
কচু	*ওয়াংছু/কাছিরিউ*

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক , নিজপাট ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম ।

প্রতি খাসিয়া বাড়ি সংলগ্ন একটি পারিবারিক বাগান থাকে যাকে তারা *খি-বাগান* বলে থাকে । এই বাগান থেকে নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়, পান, সুপারি, লেবু, মরিচ, কচু, কুমড়া, শশা, সিম উৎপন্ন করে থাকে । সবজি বা তরকারির বাগান সকলের না থাকলেও পান এবং সুপারির গাছ সকল খাসিয়া বাড়িতেই রয়েছে । কারণ

Dhaka University Institutional Repository

তারা যেমন সর্বক্ষন পান ও সুপারি খেয়ে থাকে তেমনি অতিথি আপ্যায়নে ও কাজে লাগায় । এর বিক্রয়লবদ্ধ অর্থ তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। ধনী খাসিয়ারা বেশ বড় আকাবে পানের বাগান করে থাকে। খাসিয়াদের বাগান করার এই রীতি পর্যবেক্ষন ধারনা করা যায় যে, এই উদ্যান কৃষি (horticulture) অতি প্রাচীন নৃগোষ্ঠীটির ঐতিহ্যবাহী অর্থনীতির একটি বিশেষ রীতি ।

জীবিকা নির্বাহের সহায়ক কার্যক্রম ঃ বড় ধরনের পানের ব্যবসা পরিচালনা করা ব্যতীত খাসিয়াদের রয়েছে বেশ কিছু সহায়ক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। যথাঃ

তেজপাতা *(লা-তরপাদ/তেজপাট)* সংগ্রহ ও বিক্রয় ঃ তেজপাতা বা *লা-তরপাদ/ তেজপাট* গাছ খাসিয়ারা স্থায়ী গাছ হিসাবেই রোপন করে থাকে। গাছ লাগানোর পর নিচের আগাছা পরিষ্কার করা ব্যতীত অন্য কোন যত্ন তারা নেয় না। তেজপাতা গাছের বয়স ৪ বৎসর পূর্ন হলে সেগুলো পাতা সংগ্রহের উপযুক্ত হয় । পাতা সংগ্রহের সময় হলো নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে । খাসিয়া নারী পুরুষ উভয়েই সংগ্রহের কাজে অংশ নেয় । সংগ্রহের পর পর এগুলো তারা কয়েকদিন কড়া রোদ্রে শুকিয়ে নেয় । অতঃপর বাঁশের তৈরী ঝুড়িতে *(থাবা)* সেগুলি ভর্তি করে বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে যায় ।

ফলমূল সংগ্রহ ও বিক্রয় ঃ অরন্যের নিবিড় সান্নিধ্যে বসবাসরত খাসিয়া নৃগোষ্ঠী বন থেকে প্রাপ্ত সকল বনজ সম্পদ নিজেদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করে । সীমিত আকারের কমলালেবুর বাগান ছাড়াও লেবু জাতীয় যেসব ফলমূল বনে জন্মে থাকে তারা সেসব দুর্গম পাহাড়ি বনাঞ্চল থেকে নিজেদের প্রয়োজনে সংগ্রহ করে । এছাড়াও বন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কচু (aram) বা *কা-ছিরিউ* জন্মে । দরিদ্র খাসিয়ারা এই কচু খাবার হিসাবে ব্যবহার করে । অনেক সময় যারা শুকর পালন করে তারা শুকরের খাবার হিসাবেও কচু ব্যবহার করে থাকে । কচুর মূল এবং কান্ড উভয়ই খাবার হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়ারা ব্যবহার করে থাকে। কমলা লেবু ফলন ধনী খাসিয়ারা সিলেট জেলায় খুব সীমিত পরিমানে করে থাকে । কমলা লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল সংগ্রহ করে তারা খাবার ও বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করে ।

কাঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ : পাবর্ত্য এলাকায় বসবাসরত খাসিয়াদের জীবনে গাছপালা সমৃদ্ধ ঘন অরন্য বিভিন্ন কারনে গুরুত্বপূর্ণ । এরমধ্যে ফলমূল সংগ্রহের পাশাপাশি বন থেকে নানা ধরনের কাঠ সংগ্রহ এবং বনজ উদ্ভিদ যা খাসিয়ারা ভেষজ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করে তা উল্লেখযোগ্য । ঘরবাড়ি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত কাঠ ঘরের আসবাবপত্র তৈরীর জন্য কাঠ ও তারা নিকটস্থ বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে থাকে । ঘর তৈরীর কাজে ইকড় নামক এক প্রকার বাঁশ জাতীয় গাছ তারা বন থেকে সংগ্রহ করে । খাসিয়ারা নিজেদের অসুখের সময় বনজ লতাপাতা দিয়ে নানা রকম ভেষজ ঔষধ তৈরী করে রোগমুক্তির জন্য ব্যবহার করে । এসব তারা নিকটস্থ গভীর অরন্য থেকেই সংগ্রহ করে থাকে । রান্নার কাজে ব্যবহৃত প্রতিদিনের জ্বালানী হিসাবে তারা বাঁশ, কাঠ, শুকনো ডালপালা, শুকনো পাতা, এসব ব্যবহার করে । সুতরাং এগুলোও তাদের সবসময়ের জন্য সংগ্রহ করে রাখতে হয় । গ্রীষ্মের সময় এবং বৃষ্টিহীন আবহাওয়ায় পরবর্তী বর্ষা মৌসুমের জ্বালানী তারা সংগ্রহ করে, যে উঁচু পিলারের উপর তাদের ঘরবাড়ি তৈরী হয় সেখানে সঞ্চয় করে রাখে । জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের কাজে খাসিয়া নারী এবং কিশোর-কিশোরীরা বেশী অংশ নেয় ।

পশুপাখি পালন : প্রতিটি খাসিয়া বাড়িতেই মোরগ-মুরগী পালনের ব্যবস্থা রয়েছে । বাড়ীর পিছন দিকে একটি ছোট মুরগীর ঘর প্রতিটি খাসিয়া বাড়ীতেই রয়েছে । মোরগের মাংস যেমন তাদের প্রিয় আহার্য তেমনি মোরগের ডিম তাদের সকল অনুষ্ঠানাদিতে এক অপরিহার্য উপাদান । আবার যে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে প্রানী উৎসর্গের প্রয়োজন হয়, সে সব অনুষ্ঠানাদিতে তারা বেশীর ভাগই মোরগ উৎসর্গ করে থাকে । অনেক খাসিয়ারাই

Dhaka University Institutional Repository

গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছাগল এবং শুকর পালন করে থাকে । ছাগল এবং শুকরের মাংসও তাদের খুব প্রিয় । তবে এসব প্রানীও তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে উৎসর্গ করে এবং বড় কোন ভোজের আয়োজন হলে ছাগল বা শুকরের মাংস ব্যবহার করে । প্রয়োজনের সময় মোরগ-মুরগী, ছাগল বা শুকর বিক্রয় করে তারা অর্থ সংস্থান করে থাকে ।

মদ (*খিয়েত*) তৈরী ও বিক্রয় : খাসিয়াদের মধ্যে মদ্যপান বহুল প্রচলিত । ভাত পঁচিয়ে এর সাথে ***খা-ইয়াং*** নামক এক প্রকার গাছের শিকড়ের গুঁড়া ব্যবহার করে তারা মদ তৈরী করে থাকে । ভাত রান্না করে একটি মাদুরের উপর সেগুলো ছড়িয়ে দেয়া হয়, ঠান্ডা হয়ে এলে ***খা-ইয়াং*** নামক এক প্রকার গাছের শিকড়ের গুঁড়া এর উপর ছড়িয়ে দেয়া হয় । এরপর এই ভাত একটি ঝুড়িতে ঢেলে এর মুখ শক্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং একটি বড় মাটির বা কাঠের পাত্রে ঝুড়িটিকে কয়েকদিনের জন্য রেখে দেয়া হয় । যখন ভাত পচে মদ তৈরী হয়ে পাত্রে জমা হয় তখন এই নির্যাস (liquor) পান করার উপযুক্ত হয় । এই মদ খাসিয়া নারী-পুরুষ উভয়েই পান করে থাকে । বিবাহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে মদ খাসিয়াদের এক অপরিহার্য উপাদান । মদ পান করা ছাড়া এর বিক্রি থেকে তাদের অর্থ উপার্জন হয়ে থাকে ।

মৌমাছি (*উ-নগাপ*) পালন ও মধু সংগ্রহ : গভীর অরন্যের অভ্যন্তরের মৌমাছির (*উ-নগাপ*) চাক থেকে এবং নিজেদের বাড়িতেও খাসিয়ারা মৌমাছি পালনের মধ্য দিয়ে মধু সংগ্রহ করে থাকে । মধু বিক্রয়ও খাসিয়াদের আয়ের একটি অনিয়মিত উৎস । অনেক খাসিয়া বাড়িতেই মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা করে থাকে। আড়াই থেকে তিন ফুট দৈর্ঘের এবং দশ থেকে বার ইঞ্চি প্রস্থের একটি কাঠের ফাঁপা (hollow) পাত্রে তারা মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা করে। এর দুই প্রান্তে দুটি ছোট দরজা রাখে। একটি দিয়ে মৌমাছিরা আসা যাওয়া করে এবং অন্য দরজা দিয়ে খাসিয়ার প্রয়োজন মত মধু সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে । মধু খাসিয়াদের খুবই প্রিয় । মধু সহযোগে তারা বিভিন্ন ধরনের উপাদেয় খাবারও তৈরী করে থাকে ।

খাসিয়াদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা একাধারে যেমন খাদ্য উৎপাদন কারী তেমনি আবার খাদ্য সংগ্রহকারী নৃগোষ্ঠীও বটে ।

সারনী - ৫

খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর পেশা বিন্যাস

পেশা	পরিবার (খানা)	শতকরা হার
ব্যবসা *(পান)*	৪২	৭৬.৩৬%
শিক্ষকতা	২	৩.৬৪%
স্বর্ণকার	১	১.৮১%
চাকুরী	২	৩.৬৪%
দিনমজুর	২	৩.৬৪%
অন্যান্য	৬	১০.৯১%
মোট	৫৫	১০০%

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক , নিজপাটি ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম ।

জৈন্তাপুর থানার অধিকাংশ খাসিয়ারাই পানের ব্যবসায় নিয়োজিত । ৫৫টি পরিবারের মধ্যে ৪২টি পরিবারই অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৬.৩৬% ই পানের ব্যবসায় নিয়োজিত । শিক্ষকতা পেশায় আছেন শতকরা ৩.৬৪% এবং টেলিফোন অপারেটর ও হাসপাতালের আয়ার চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন ৩.৬৪% । স্বর্ণকারের পেশায় নিয়োজিত আছেন ১.৮১% এবং মদ বিক্রয় ও মৌমাছি পালন ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে ১০.৯১% । সরাসরি দিনমজুর বা শ্রমিক যারা মজুরীর বিনিময়ে অন্যের বাগানে বা জমিতে কাজ করে এরকম পেশায় রয়েছে ৩.৬৪% খাসিয়া ।

আয় ঃ সিলেট জেলার খাসিয়াদের আয়ের প্রধান উৎস হলো পান সুপারী উৎপাদন এবং এগুলো বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা । তবে আর্থিক দিক থেকে বিবেচনা করলে তাদের মধ্যে শ্রেনী বিভাগ দেখা যায় ।

সারনী - ৬

খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর আয়ের বিন্যাস

আয়	পরিবার (খানা)	শতকরা
০১/- - ১০০০/-	০	০%
১০০০/- - ৩০০০/-	১৪	২৫.৪৫%
৩০০০/- - ৫০০০/-	১৭	৩০.৯১%
৫০০০/- - ৭০০০/-	১৪	২৫.৪৫%
৭০০০/- - ১০,০০০/-	৯	১৬.৩৭%
১০,০০০/- - তদুর্ধ	১	১.৮২%
মোট	৫৫	১০০%

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক, নিজপাটি ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম ।

৬ নং সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০.৯১% খাসিয়ার আয় ৩০০০/- থেকে ৫০০০/- টাকার মধ্যে এবং ২৫.৪৫% এর আয় ৫০০০/- টাকা থেকে ৭০০০/- টাকার মধ্যে যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর নির্দেশক। ২৫.৪৫% খাসিয়ার আয় ১০০০/- টাকা থেকে ৩০০০/- টাকার মধ্যে এরাই মূলতঃ গরীব বা দরিদ্র শ্রেনী ।

Dhaka University Institutional Repository

৭০০০/- টাকা থেকে ১০০০০/- টাকা আয় করে ১৬.৩৭% খাসিয়া । এদেরকে ধনী বা বিত্তবান শ্রেনী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় । উল্লেখ্য অধিকাংশ পরিবারে কমপক্ষে একজন এবং অনেক পরিবারেই দুই বা ততোধিক উপার্জনশীল সদস্য রয়েছে । ধনী খাসিয়াদের প্রচুর জমি রয়েছে যেখানে তারা পান চাষ করে ।

সারনী - ৭

খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর জমির বিন্যাস

জমি	পরিবার (খানা)	শতকরা
০ - ০. ৫ একর	১৫	২৭.২৮%
০.৫ - ১ একর	৯	১৬.৩৬%
১ - ৫ একর	২০	৩৬.৩৬%
৫ - ১০ একর	৪	৭.২৭%
১০ - ১৫ একর	৩	৫.৪৫%
১৫ একর - তদুর্ধ	৪	৭.২৮%
মোট	৫৫	১০০%

উৎস ঃ ফিল্ড ওয়ার্ক, নিজপাট ও মোকামপুঞ্জি গ্রাম ।

খাসিয়াদের জমি পাহাড় ও সমতল দুই স্থানেই রয়েছে । তবে বেশীর ভাগ জমিই পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত । ৭ নং সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, ২৭.২৮% খাসিয়ার বসতবাড়ি ছাড়া অন্য কোন জমি নেই । ১৬.৩৬% এর জমি ০.৫ থেকে ১ একরের মধ্যে । ১ থেকে ৫ একর পর্যন্ত জমির মালিক হচ্ছে ৩৬.৩৬% খাসিয়া । এদের সংখ্যাই গবেষনাধীন এলাকার মধ্যে সর্বাধিক । ৭.২৭% খাসিয়া ৫ থেকে ১০ একর জমির মালিক । ১০ থেকে ১৫ একর জমির মালিক হচ্ছে ৫.৪৫% খাসিয়া । ১৫ এবং তদুর্ধ পরিমান জমির মালিকানায় রয়েছে ৭.২৮% খাসিয়া ।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ছোট এবং প্রান্তিক চাষীরাই খাসিয়া সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনশক্তি। কিন্তু তথাপি মর্যাদার দিক থেকে দেখা যায় যে, "জমি বেশী যার মর্যাদা বেশী তার।" কাজেই 'জমি' খাসিয়া সমাজে মর্যাদালাভের একটি অন্যতম উপায় বা নির্নায়ক।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার (Inheritance): খাসিয়া সমাজ মাতৃসূত্রীয় (matrilireal) হওয়ায় মাতার মৃত্যুর পর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। সম্পত্তি উত্তরাধিকারের এই নিয়ম খাসিয়া সমাজকে দান করেছে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাদের সমাজে বসতবাড়ি, ফলের বাগান, জুমের জমি, মূল্যবান গাছ (যা থেকে দামী কাঠ হয়, যথা ঃ সেগুন, কড়ই ইত্যাদি), গহনা, হাতিয়ার (তীর-ধনুক, দা, তরবারি কুঠার ইত্যাদি,) তৈজসপত্র, ব্যবহৃত আসবাবপত্র, এসব মূল্যবান সম্পত্তিরুপে বিবেচিত হয় এবং এগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে কন্যা মাতার নিকট থেকে লাভ করে। আবার প্রতিটি নারী বা পুরুষই তাদের জীবিতাবস্থায় নিজস্ব আয় থেকে প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করতে পারে। যেমন অর্থ, গৃহপালিত পশুপাখি, রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি, বাবহার্য সব ধরনের আসবাবপত্র ইত্যাদি।

খাসিয়া সমাজ ব্যবস্থা মাতৃসূত্রীয় এবং মাতৃআবাসিক বিধায় সম্পত্তি উত্তরাধিকারের নিয়মে মাতাব মৃত্যুর পর সম্পত্তি লাভ করে কন্যা। খাসিয়া পুরুষেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। যদিও বিবাহের পূর্বে মাতা এবং বিবাহেব পরে স্ত্রীর সম্পত্তির দেখাশোনার ভার তার উপরেই ন্যস্ত থাকে। তবে সারাজীবন ব্যাপী খাসিয়া পুরুষ প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করতে পারে এবং ভোগ করতে পারে। কিন্তু খাসিয়া পুরুষের জীবদ্দশায় অর্জিত সমুদয় সম্পত্তি মৃত্যুর পর তার মায়ের অধিকারে চলে যায়। নিম্নে খাসিয়া সমাজে সম্পত্তি উত্তারধিকারের নিয়মগুলি আলোচনা করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১। মাতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠা কন্যা পারিবারিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার লাভ করে। কনিষ্ঠা কন্যা খাসিয়া সমাজে *কা-খাড়ু* (ka khadduh) নামে অভিহিত হয়। সম্পত্তি লাভের পাশাপশি কা-খাড়ু'র উপর প্রভূত দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। যথা ঃ

(ক) সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের মূল দায়িত্ব কনিষ্ঠা কন্যা বা *কা খাড়ু'র* ।

(খ) মাতার মৃত্যুর পর তার *শবদাহ* করার যাবতীয় দায়িত্ব কনিষ্ঠা কন্যাকে পালন করতে হয়।

(গ) খাসিয়া সমাজের একটি বিশেষ নিয়ম হলো মৃত্যুর পর কোন নির্দিষ্ট গোত্রের সকল সদস্যের মৃতদেহ সংকারকৃত অস্থি (bones) প্রতিটি গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত করে রাখা হয়। পাথরের তৈরী বিশেষভাবে নির্মিত এই স্থানটির নাম *মাউবাহ্* (clan ossuary) এবং মৃতদেহের দাহকৃত অস্থি সংরক্ষনের স্থানটির জন্য প্রতিটি গোত্রেরই এটা রয়েছে। গোত্রের এই বিশেষ স্থানটির সার্বিক রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব *কা-খাড়ু* বা কনিষ্ঠা কন্যাই বহন করে থাকে। কোন নির্দিষ্ট *শবদাহ* (মৃতদেহ পোড়ানো) অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে অবশিষ্ট অস্থি (bones) পরিষ্কার করে যত্নসহকারে খাসিয়ারা এই *মাউবাহ্* নামক সংরক্ষনাগারে রেখে দেয়। স্ত্রীর বাড়ীতে কোন খাসিয়া পুরুষের মৃত্যু হলে তার দাহকৃত অস্থি (**bones**) তার মাতার বাড়ীতে স্বীয় গোত্রের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয় সংরক্ষনের জন্য । এই নিয়মটি পর্যবেক্ষনে প্রতীয়মান নয় যে, একজন খাসিয়া জীবনে যেমন তার গোত্রের একজন সদস্য মৃত্যুর পরও সে গোত্রের একজন সদস্য। একজন খাসিয়া নারী বা পুরুষ জন্ম, মৃত্যু বা বিবাহ কোন কারনেই গোত্রান্তরিত হয় না।

(ঘ) পরিবারের যে সকল সদস্য উপার্জনক্ষম নয় অথবা উপার্জন করার মত সন্তান যাদের নেই তারা *কা-খাড়ুর* সাথে থাকে এবং তাদের ভরণ পোষনের দায়িত্বও *কা-খাড়ুই* বহন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) খাসিয়া সমাজে মৃতদেহ *দাহ* অনুষ্ঠানটি ব্যয়বহুল এবং নির্ভরশীল সদস্যদের ব্যয়ভার বহন দুই-ই ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার বিধায় পারিবারিক সমুদয় সম্পত্তি (মৃত মাতার থেকে প্রাপ্ত) ২/৩ অংশ (দুই তৃতীয়াংশ) কনিষ্ঠা কন্যা *কা-খাড়ু* পেয়ে থাকে। অবশিষ্ট ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) *কা-খাড়ু'র* বয়োজেষ্ঠ্য বোন বা বোনেরা (যদি থাকে) সমভাবে পেয়ে থাকে।

(চ) পরিবারের মূল বাড়িটি (যেখানে মাতা বাস করেন) কনিষ্ঠা কন্যা পায়। তবে অন্যান্য বোনদের বিবাহের পর তাদের স্বামীরা বসবাসের জন্য এই বাড়িতে আসলেও এক বা একাধিক সন্তানের জন্মের পর এই বাড়ির নিকটেই ঘর তুলে তারা পৃথক বসবাস শুরু করে।

২। খাসিয়া পুরুষেরা মাতা এবং স্ত্রী উভয়েরই সম্পত্তির দেখাশুনার ও রক্ষনাবেক্ষনর দায়িত্ব পালন করে থাকে কিন্তু কোন তরফ থেকেই খাসিয়া পুরুষেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। তবে খাসিয়া পুরুষেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হবার কারণে তারা যে জীবনকে উপভোগ করতে পারে না তা নয়। বরং সারাজীবনের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেও তা ভোগ করতে পারে। খাসিয়া সমাজে কিছু ক্ষেত্রে পুরুষেরা বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন, অতীতে যখন খাসিয়া রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন রাজা বা *সিয়েম* পদটি লাভ করতো পুরুষ। বর্তমানে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হবার পর খাসিয়ারা গ্রাম প্রধান বা *পুঞ্জিপ্রধান* ('মন্ত্রী' বা *হেডম্যান*) হিসাবে কোন পুরুষকেই সাধারণতঃ নির্বাচন করে থাকে। (এ সম্পর্কে রাজনৈতিক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। এছাড়া খাসিয়ারা রোগ বা অসুস্থ্যতায় কবিরাজ (থামান) এর কাছে চিকিৎসার জন্য যায়। এই *থামান* বা কবিরাজ সাধারনতঃ পুরুষেরাই হয়ে থাকে এবং এজন্য তারা *(থামান)* বিশেষ সম্মান লাভ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম বিভাজন (শ্রম বিভাজন) : জীবন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য খাসিয়া নারী পুরুষ সকলেই কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। তাই খাসিয়া সমাজের নারী পুরুষের রয়েছে নির্দিষ্ট কর্মময় ভূমিকা। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর বৈশিষ্ট্যে জীবন যাপনকারী খাসিয়ারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নানা কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। আধুনিক জীবনের প্রযুক্তি ও কৌশল গুলোকে যদিও তারা আজও আপন করে নিতে পারেনি তথাপি তাদের নিজস্ব জীবন যাপন পদ্ধতিই তাদেরকে দান করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। খাসিয়া নারী এবং পুরুষ উভয়ই কর্মের নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে। যদিও খাসিয়া সমাজে নারীর কর্তৃত্ব এবং প্রাধান্যই বেশী তথাপি পুরুষেরা নিজেদের কর্মদক্ষতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে। জুম চাষের যাবতীয় কাজ (যদিও এতে খাসিয়া নারীর সহায়ক ভূমিকা রয়েছে), পান চাষ থেকে পান সংগ্রহ পর্যন্ত খাসিয়া পুরুষ প্রচুর কায়িক শ্রম দিয়ে থাকে। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মাতার সম্পত্তির দেখাশুনা এবং ব্যবসার কাজ দেখা, বিবাহের পর স্ত্রীর সম্পত্তির যাবতীয় দেখাশোনা এবং রক্ষনাবেক্ষন খাসিয়া পুরুষই করে থাকে। যোগ্যতা অনুযায়ী খাসিয়া পুরুষেরাই সাধারণত গ্রাম প্রধান বা *পুঞ্জি* প্রধান (মন্ত্রী বা হেডম্যান) নির্বাচিত হয়ে থাকে। খাসিয়া সমাজে নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং পরিবারের কর্তৃত্ব তাদের হাতেই থাকে। সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব নারীরাই রেখে থাকে। বৃদ্ধ পুরুষ বা নারী পরিবারের গৃহপালিত পশুপাখিদের খাবার দেয়া ও যত্ন নিয়ে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব অল্প বয়সেই নিজেদের কাজকর্মগুলো করে নিতে শেখে। পরিবারের কিশোর কিশোরীদের উপর থাকে ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব।

এই সকল দায়িত্ব কর্তব্য এবং যার যার কর্মময় ভূমিকা খাসিয়া শিশু-কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করে এবং সীমিত পার্থিব দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থেকে হাসিখুশী, প্রানবন্ত জীবন যাপনের জন্য সচেষ্ট থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বাজার (Market) : খাসিয়ারা যেহেতু বড় ধরনের পানের ব্যবসা পরিচালনা করে সঙ্গত কারনেই তাদের বাসস্থানের আশে পাশে বাজার গড়ে উঠেছে । এখানেই তাদের ব্যবসা বানিজ্য করতে দেখা যায় ।

খাসিয়াদের সাতদিনের নির্দিষ্ট কোন নাম নেই । প্রত্যেক গ্রামেই (*পুঞ্জিতে*) সপ্তাহে একবার হাট বসে । সেই সব বিভিন্ন গ্রামের হাটের নাম অনুসারে দিনের নামকরণ করা হয় । যেমন " আজ রাধানগর এর দিন " অর্থাৎ আজ রাধানগর গ্রামে হাট বসবে । খাসিয়াদের ব্যবসা বানিজ্যের প্রধান প্রধান পন্য সামগ্রী হচ্ছে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফসলাদি, শস্য, ফলমূল ইত্যাদি । এসবের মধ্যে পান, সুপারি, কমলালেবু, কলা, আনারস এবং তেজপাতা প্রধান। যে গ্রামে যেদিন হাট বসে সে গ্রামে সেদিন প্রানচাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা বেড়ে যায় । খাসিয়া রমনীরা পানের ঝুড়ি (*থাবা*) সাজিয়ে হাটে যায় এবং বেলা শেষে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। পুরুষেরাও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে হাটে গমন করে। স্থানীয় বাঙ্গালী জনসাধারণও তাদের কেনাকাটার প্রয়োজনে এসব বাজারে আসে। অতি সাম্প্রতিক সময়ে জৈন্তাপুর থানার খাসিয়া পাড়ার ভিতরে কিছুটা আধুনিক কায়দায় দু'একটি মনোহারি দোকান দেয়া হয়েছে, সেগুলো পাড়ার ধনী খাসিয়া পরিবারের যুবকেরা পরিচালনা করছে। এসব দোকানে সিলেট শহর থেকে দ্রব্য সামগ্রী কিনে এনে বিক্রয় করা হয়।

সাম্প্রতিক কালের এরকম দু' একটি পরিবর্তন ছাড়া প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রীতিতেই খাসিয়ারা তাদের সার্বিক অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক সংগঠন

খাসিয়াদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অনন্য সংগঠন। তাদের প্রাচীনত্বের মতই বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বহু বছর ধরে তাদের সংঘবদ্ধ করে রাখতে পেরেছে। পার্বত্য এলাকায় বসবাসের কারনে এলাকার ভৌগলিক অবস্থা তাদের জীবনকে সর্বতোভাবেই প্রভাবিত করেছে। একারনে তাদের প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং সমস্যাবলী সবই সমতলের জীবন থেকে ভিন্নতর। যে কারনে খাসিয়াদের রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতি ও ধরণ ভিন্নরুপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

বৃটিশ ভারতে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত খাসিয়াদের সমাজে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। পি. আর. টি. গর্ডন (১৯০৭) এর বর্ননামতে " The head of the khasi state is the siem or cheif. A khasi state is a limited monarchy, the Siem's powers being much circumscribed." (Gurdon;1907: 66)

কমলেশ্বর সিনহা'র (১৯৭০) বর্ননা হতেও খাসিয়া রাজনীতির ধারা সম্পর্কে জানা যায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, " Before independence, there were fifty syiems or kings in the khasi Hills with as many kingdoms. They were in some respects like the "free" state under the British rule." (সিনহা, ১৯৭০ ঃ ১৬)।

Dhaka University Institutional Repository

এসব প্রাপ্ত হতে এটা জানা যায় যে, তদানিন্তন " খাসি ও জৈন্তিয়া হিলস্ " এর খাসিয়া প্রধানরা *সিয়েম,* (siem) নামে অভিহিত হতেন এবং ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র রাজ্য পরিচালনা করতেন । কিন্তু সিলেট অঞ্চলের সমতলের জৈন্তায় তাদের যে রাজত্ব গড়ে ওঠে তাতে খাসিয়া প্রধানরা *রাজা* উপাধিই প্রাপ্ত হতেন ।

ইষ্ট পাকিস্তান ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজিটিয়ারের(East Pakistan District Gazetteers, Sylhet) বর্ননানুযায়ী, ' In some remote past a section of Austric people called T'sin-T'aing or T'sin-tien or Synteng and later, Jaintia along with other groups of their race known as *Kha-chai* or khasia migrated from china and ultimately establish a habitat in the hills now known as Khasi and Jaintia Hills where they established a kingdom having an elected chief, Headman or Rajah (king) from the Jaintia group. Under the king they had a headman, for each locality or clan. While the headmanship over a clan was elective, the kingship was heriditary.' (E.P.D.G. Sylhet: 1970, P-45,46)

আমিনুল ইসলাম (১৯৮৯) লিখেছেন , " জয়ন্তিয়া পাহাড়াঞ্চলে এককালে এদের একটি রাজত্ব গড়ে উঠেছিল । বাংলাদেশের সিলেট শহরের উত্তর পূর্ব কোনে যে বড় বড় টিবি চোখে পড়ে ; সেগুলো ছিল এককালে এই পনার বা জয়ন্তিয়াদের সালিশ বৈঠকের নির্দিষ্ট স্থান। " (ইসলাম ; ১৯৮৯ ; ১৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৫ সাল পর্যন্ত 'খাসিয়া' ও 'জৈন্তিয়া' হিল্‌সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাসিয়া রাজ্যগুলো *(সিয়েম)* দ্বারা এবং সমতলের জৈন্তাপুরের খাসিয়া রাজ্য খাসিয়া *রাজা* দ্বারা শাসিত ছিল ।

যেভাবে এই খাসিয়া রাজত্বের অবসান ঘটে সে প্রসংগে ইষ্ট পাকিস্তান ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজিটিয়ারে বলা হয় , " Independence of Jaintia Raj remained undisturbed till 1835 when it was annexed to the British Territory on the allegation that British subject were kidnapped and sacrificed before deity kali , by some Jaintia people and the king refused to do any thing against such a heinous act. The young king Indro Singh was taken as prisoner to sylhet and was given a personnel allowance of Rs. 500 per month. Thus an ancient kingdom established several hundred centuries before Christ, and renounced for its pan (betel leaf), pani (crystal clear water) and Nari (woman) and widely talked about in other parts of India, was totally annihilated."
[East Pakistan District Gazetteers ; Sylhet: 1970:51]

এভাবে সিলেট জেলার জৈন্তপুরে খাসিয়া রাজত্বের অবসান ঘটার পর খাসিয়াদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে *পুঞ্জি* বা গ্রামভিত্তিক হয়ে পড়ে । পুঞ্জি কে কেন্দ্র করেই এবং পুঞ্জি'র অভ্যন্তর থেকেই খাসিয়া নেতৃত্ব গড়ে ওঠে ।

এ প্রসংগে সিন্‌হা উল্লেখ করেন , " The Khasis practice a pure form of democracy. A village has a village durbar presided over by the headman, where every adult participates." (সিন্‌হা, ১৯৭০ ঃ ২৫৪, ২৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বের ধরন ঃ খাসিয়াদের গ্রামগুলো *পুঞ্জি* নামেই পরিচিত । তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড এই *পুঞ্জি* কে ঘিরেই পরিচালিত হয় । প্রতিটি গ্রাম বা পুঞ্জিতেই একজন করে গ্রাম প্রধান বা *পুঞ্জি প্রধান* থাকেন । যিনি *মন্ত্রী* বা হেডম্যান বা *সর্দার* নামে অভিহিত হয়ে থাকেন । প্রতিটি *পুঞ্জি'র* এই গ্রাম প্রধান নির্বাচন একটি গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া । *পুঞ্জি'র* সকল বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের (নারী - পুরুষ উভয়েই) মিলিত হ্যাঁ-বোধক সমর্থনের মাধ্যমেই কোন একজনকে *মন্ত্রী* বা *হেডম্যান* নির্বাচন করা হয় । নেতা নির্বাচনের সময় পুঞ্জির সকল বয়োজেষ্ঠ্য ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হবার জন্য প্রতিটি পুঞ্জিতেই সাধারনত একটি বিশেষ স্থান থাকে (যেটি খেলার মাঠ হিসাবে বা বিভিন্ন উৎসবে একত্রে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়) । এই স্থানে সকলে মিলিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচন করে থাকেন । যেহেতু *পুঞ্জি* বাসীর সকলের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষার্থেই *মন্ত্রী* বা *হেডম্যান* নির্বাচন করা হয় সুতরাং *হেডম্যান* বা *মন্ত্রী* কর্তৃক কোন ভাবে *পুঞ্জি'র* সকলের বা কারো অথবা কোন বিশেষ অংশের ক্ষতি বা স্বার্থ বিঘ্নিত হলে *পুঞ্জিবাসী* সকলে মিলিতভাবেই তাকে এ পদ থেকে অপসারণ করতে পারে ।

নেতৃত্বের উৎস ঃ গ্রামবাসী বা পুঞ্জিবাসীদের সমর্থনই খাসিয়া নেতৃত্বের সর্বপ্রধান উৎস । তবে যিনি মন্ত্রী বা হেডম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁকে বেশ কিছু গুনাবলীর অধিকারী হতে হয় । যেমন ঃ

(ক) তিনি পুঞ্জি'র একজন স্থায়ী বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি পুঞ্জিতে সকলের সাথে একত্রে মিলেমিশে সুনামের সাথে বসবাস করছেন ।

(খ) পুঞ্জির সকলে তাকে পছন্দ ও বিশ্বাস করে ।

(গ) তিনি অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ।

(ঘ) কোন অপরাধ সংগঠিত করার জন্য পুলিশের খাতায় তাঁর নাম নেই ।

(ঙ) তিনি সৎ এবং সাহসী ।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া সমাজে মন্ত্রী বা হেডম্যানের ভূমিকা ঃ খাসিয়া সমাজে *মন্ত্রী* বা হেডম্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি সামাজিক সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করেন। বস্তুতঃ *পুঞ্জি'র* সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মন্ত্রী বা হেডম্যান সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাঁর প্রতি সমাজের সকল সদস্য অনুগত। হেডম্যান বা মন্ত্রী প্রধানতঃ যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তার মধ্যে রয়েছে ঃ

(১) মন্ত্রী সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এবং উৎপাদিত ফসলের স্বত্বভোগ করেন।

(২) পুঞ্জি'র সার্বিক আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে।

(৩) গ্রাম্য বিরোধের মীমাংশা করা।

(৪) স্থানীয় জনসাধারণ অথবা খাসিয়া নৃগোষ্ঠী বহির্ভূত কোন লোকজন *পুঞ্জি'র* অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য *মন্ত্রী* বা *হেডম্যানের* অনুমতির প্রযোজন হয়।

(৫) ছোটখাট অপরাধের মীমাংশা করা। তবে হত্যা, অপহরণ ইত্যাদির মত বড় ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে তারা পুলিশের সাহায্য নেয়।

(৬) স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের (খাসিয়া নয়) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

(৭) পুঞ্জি গুলো দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত বলে সেখান কার পথঘাট তৈরী ও সংস্কারে মন্ত্রী'র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে।

(৮) পুঞ্জি'র পানীয় জলের ব্যবস্থা করা মন্ত্রীর দায়িত্ব। এলাকার অভ্যন্তরে নলকূপ বা কুয়া খননের ব্যাপারে তার ভূমিকা রয়েছে।

(৯) খাসিয়ারা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। মন্ত্রীর নেতৃত্বে তারা তাদের বসবাস এলাকা এবং চাষাবাদযোগ্য ভূমির রক্ষনাবেক্ষন করে থাকে।

(১০) এক পুঞ্জির সাথে অন্য পুঞ্জির কোন কারনে বিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করা মন্ত্রীর দায়িত্ব।

(১১) মন্ত্রী সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে গোষ্ঠীর সদস্যদের অনুপ্রানিত করেন এবং প্রয়োজনমত সেগুলোতে নিজেও অংশগ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালনের জন্য খাসিয়া মন্ত্রী তাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত একজন ব্যক্তি। যে কারনে সকলেই তাকে মান্য করে। যেহেতু দায়িত্ব অবহেলা এবং ব্যর্থতা বা শারীরিক অসমর্থতার কারনে তাকে মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারন করা যায় সেকারনে খাসিয়া সমাজে মন্ত্রী স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন না বা ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে নিজকে বিরত রাখেন।

খাসিয়ারা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রতি মনে-প্রানে অনুরক্ত এবং বিশ্বস্ত একারনে তারা কোন ধরনের পরিবর্তন গ্রহনে অনগ্রহী। তাদের মধ্যে বিদ্যমান প্রাচীন প্রথা ও রীতিগুলোকে তারা যথাসম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং একারনেই তারা স্থানীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশায় অগ্রহী নয়। এসব কারনে তারা নিজেদের নেতার (*মন্ত্রীর*) মাধ্যমে নিজস্ব সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করে। তবে অল্প কিছু সংখ্যক খাসিয়া যারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেছেন তারা ধীরে ধীরে আধুনিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু বৃহত্তর খাসিয়া গোষ্ঠীর মতামতের কাছে তাদের নিজস্ব মতামত খুব একটা প্রাধান্য পায় না। যদিও খাসিয়া গ্রামপ্রধান বা মন্ত্রী নিজে এবং গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নারীপুরুষ জাতীয় নির্বাচনের সময় ভোট প্রদান করে থাকেন তবুও দেশের বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ খুবই কম। কারণ তারা মনে করেন যে, দেশের চলমান রাজনীতি এবং এর পরিবর্তন এই অবহেলিত নৃগোষ্ঠীর কোন প্রয়োজনে সাহায্য করে না।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মবিশ্বাস ও অতিপ্রাকৃত জগত

খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর জীবনধারায় তাদের ধর্মবিশ্বাসের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যদিও তারা এই পৃথিবীর এবং মানব-মানবীর সৃষ্টিকর্তারূপে *উব্লাই-নংথাউ* নামক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (God) এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে । তথাপি বহু আত্মা-প্রেতাত্মায় বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় জীবনের বিশেষ দিকরূপে বিদ্যমান রয়েছে। এসব আত্মা বা প্রেতাত্মা কতিপয় ক্ষেত্রবিশেষে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী বলে তারা বিশ্বাস করে। সেকারনে এসব আত্মা বা প্রেতাত্মারাই তাদের *দেব-দেবী* এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একবার করে অথবা হটাৎ উপস্থিত সংকটের সময় নানা রকমের প্রাণী (ছাগল, মোরগ অথবা শুকর) উৎসর্গের মাধ্যমে এসব অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাধর শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখতে খাসিয়ারা সদা সচেষ্ট থাকে। তবে তারা এধরণের শক্তিগুলোর কোনো প্রতীক (image) তৈরী করেনা। প্রাণী উৎসর্গ (বধ) করাই তাদের ধর্মীয় উপাসনার প্রধান অঙ্গ। যেহেতু আত্মা বা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস তাদের ধর্মবিশ্বাসের সর্বাপেক্ষা বড় দিক সে কারণে তাদেরকে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী **(animist)** হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

খাসিয়ারা বিশ্বাস করে যে, জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে আর মৃত্যুর পরে বিদেহী আত্মা সৃষ্টিকর্তার *(উব্লাই-নংথাউ)* স্বর্গরাজ্যে চলে যায়। পান এবং সুপারি খাসিয়াদের অতি প্রিয় উপকরণ হওয়ায় তাদের স্বর্গরাজ্যে'র চিন্তাও পান এবং সুপারির প্রভাবমুক্ত নয়। একারণে তাদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি প্রবচন হলো ঃ

"কুবলাই, কুবলাই খী লিত বাম
কবাই স ই ইং ও ব্লি-হো।"

(বিদায়, বিদায় চলে যাও এবং ইশ্বরের স্বর্গরাজ্যে গিয়ে পান সুপারি খাও।)

Dhaka University Institutional Repository

এই বাক্যটি তারা কোনো মৃতের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে থাকে। যে কারণে মৃতদেহ সৎকার অনুষ্ঠানটি তারা খুব যত্ন সহকারে পালন করে, যাতে মৃতের বিদেহী আত্মার স্বর্গলাভ হয় এবং আত্মা শান্তিতে থাকে।

সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা তিনটি ধর্মবিশ্বাসের সাথে যুক্ত হয়েছে। তাদের কিছু অংশ অতিপ্রাচীন মূল খাসিয়া ধর্মেই অবস্থান করছে। আর কিছু অংশ হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং বাকী অংশ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছে। তবে মূল খাসিয়া ধর্ম ব্যতীত যে সব ধর্ম তারা পরবর্তীতে গ্রহন করেছে সেগুলোর রীতি-নীতিগুলো তার আংশিকভাবেই গ্রহন করেছে বলে প্রতীয়মান হয় । যথাঃ তাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকারের নিয়ম খ্রীষ্টান বা হিন্দু ধর্মের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়নি এছাড়া তাদের সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও এসব ধর্ম বিশেষ কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সেকারনেই যারা নিজেদের হিন্দু খাসিয়া বলে পরিচয় দেয় তারা হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসব বা পার্বনে অংশগ্রহন করে মাত্র। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা এবং পিতৃসূত্রীয় সামাজিক ব্যবস্থা এর কোনটাই তারা গ্রহন করেনি। শুধুমাত্র কিছু কিছু ধর্মীয় উৎসবাদি তারা হিন্দুদের অনুকরণে পালন করে মাত্র । যথা ঃ **ভে-দিং-খ্লাম** নামক খাসিয়াদের একটা উৎসব রয়েছে যা অনেকটা হিন্দুদের রথযাত্রার মত। এসবের সাথে তারা তাদের আদি খাসিয়া ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতিগুলো পালন করে থাকে। আরেকটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ নামকরণের ক্ষেত্রে হিন্দুদের মতই তারা বাংলা নাম রেখে থাকে। যথা ঃ পরিমল, শেফালী ইত্যাদি।

যেসকল খাসিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছে তারা বড়দিনে উৎসব পালন করে থাকে। স্থানীয় গীর্জায় যেয়ে প্রার্থনা করে এবং এর পাশাপাশি প্রাচীন ধর্মীয় রীতি-নীতি গুলোও অনেকাংশে পালন করে। সন্তান-সন্ততির নামকরণের সময় তারা খ্রীষ্টানদের মতই ইংরেজী নাম রেখে থাকে যেমন ঃ ডেভিড, জিম ইত্যাদি। তবে এসব নামের সাথে পদবী হিসাবে নিজেদের প্রাচীন গোত্রের *(কুর)* নামটিও (যথা ঃ রুম্ভাই, ডিখার) যুক্ত করে দেয়। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবেও তাদের মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রাচীন নিয়মে কোনরুপ ফাটল ধরাতে পারে নাই। এসব প্রাচীন ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজ অদ্যাবধি পূর্বের ন্যায় সজীব এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত ভাবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ঃ

বিভিন্ন ধরণের অতিপ্রাকৃত শক্তির উপাসনা ঃ খাসিয়ারা বিশ্বাস করে যে, অরণ্য প্রকৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে অসংখ্য আত্মা-প্রেতাত্মা যারা কিনা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। শস্যহানী, রোগ-ব্যাধির প্রকোপ এবং প্রাত্যহিক জীবনের নানারকম সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির জন্য দায়ী হলো এসব অতিপ্রাকৃত শক্তি। তাই জগতের সহায় সম্পদ লাভ করার জন্য এবং রোগবালাই সহ নানা ধরণের অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তারা এসব আত্মা এবং প্রেতাত্মাকে বিভিন্ন প্রাণী (যেমন-শুকর, ছাগল, মোরগ) উৎসর্গের মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করে।

নিম্নে খাসিয়াদের উপাস্য কতিপয় আত্মা বা প্রেতাত্মা (যাদের তারা দেব-দেবী জ্ঞানে উপাসনা করে থাকে) সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

উ-লেই-মূলক ঃ *উ-লেই-মূলক* হচ্ছে সাম্রাজ্যের পরিচালক। তাঁর ইচ্ছাতেই এই জগত পরিচালিত হয় বলে খাসিয়াদের ধারনা। এজন্য এই দেবতার উদ্দেশ্যে তারা বৎসরে একবার একটি ছাগল বা মোরগ উৎসর্গ করে থাকে।

উ-লেই-আমতং ঃ *উ-লেই-আমতং* হচ্ছে পানির দেবতা। বিশুদ্ধ পানি পাবার জন্য (পানের উপযোগী), ফসলের জন্য বৃষ্টিপাত যেন উপযুক্ত সময়ে হয়, পানিতে পারাপার করার (নদীতে, খালে) সময় যাতে কোন বিপদ না হয় এজন্য এ দেবতাকেও খাসিয়াদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। বৎসরে একবার একটি ছাগল বা মোরগ তারা এ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে থাকে।

উ-লেই-লংসপাহ্ ঃ *উ-লেই-লংসপাহ্* হচ্ছে খাসিয়াদের ধনসম্পদের দেবতা। ধন সম্পদ কামনায় এবং এসবের ক্ষতির আশংঙ্কায় এ দেবতার উদ্দেশ্যেও তাদের প্রাণী উৎসর্গ করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উ-রিং-খেউ বা *উ-বাসা* ঃ *উ-বাসা* বা *উ-রিং-খেউ* হচ্ছে খাসিয়াদের গ্রাম-দেবতা। কোন গ্রামের কল্যাণ ও সুখ শান্তি এর সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে বলে খাসিয়ারা বিশ্বাস করে। সেকারণে এর উদ্দেশ্যেও তারা প্রাণী উৎসর্গ করে থাকে।

এসব *দেবতার* উপাসনা তারা বৎসরে একবার করে থাকে। কিন্তু হটাৎ বিশেষ প্রয়োজনে বা সংকট মূহুর্তেও তারা এদের উপাসনা করা থাকে।

এরকম বিভিন্ন ধরণের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন আত্মা বা প্রেতাত্মায় খাসিয়ারা বিশ্বাস করে এবং তাদের উপাসনা করে থাকে। আবার বিশেষ বিশেষ পাহাড়ে বা নদীর উপরেও কোন কোন আত্মা বিরাজ করে বলে খাসিয়ারা বিশ্বাস করে। গ্রামের আশপাশেই কিছু স্থান রয়েছে যেখানে নানা ধরণের গাছপালা, অর্কিড এবং ফার্ণ জাতীয় গাছ রয়েছে সেগুলোকে তারা 'পবিত্র বৃক্ষরাজি' রুপে (sacred groves) ভক্তি করে। এসব গাছপালা তারা কখনও কাটেনা বা নষ্ট করেনা। কারণ এই 'পবিত্র বৃক্ষরাজি' সম্বলিত স্থানে যে আত্মা বাস করে, গাছপালা কেটে ফেললে বা বনের ক্ষতি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন বলে তারা বিশ্বাস করে এবং এরফলে তাদের জীবনে অভিশাপ ও অশান্তি নেমে আসবে বলে তাদের ধারনা রয়েছে। এই ''পবিত্র বৃক্ষরাজি'' সম্বলিত স্থানেই তারা *উ-বাসা* নামক দেবতার উপাসনা করে থাকে।

খাসিয়াদের ধর্মবিশ্বাসের আরও একটি প্রাচীন দিক রয়েছে যা এখনও অনেক খাসিয়াই বিশ্বাস করে তা হলো বিভিন্ন রোগ ব্যাধির কারণ হিসাবে তারা নানা রকম প্রেতাত্মা'র প্রভাবের উপর বিশ্বাস করে থাকে যেমন ঃ

ক) ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ হলো - *কা-রিহ্*,

খ) কলেরা রোগের কারণ হলো - *কা-খ্লাম্*,

গ) সাধারণ জ্বর ব্যাধির কারণ হলো - *কা-ডুবা* নামক অতিপ্রাকৃত শক্তি।

এভাবে খাসিয়াদের ধর্মবিশ্বাসের অনেক খানিই জুড়ে রয়েছে এরুপ অসংখ্য অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন আত্মা বা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বপুরুষের উপাসনা ঃ খাসিয়া ধর্মবিশ্বাসের আরেকটি অন্যতম প্রধান দিক হলো- মৃত পূর্বপুরুষের আত্মার উপাসনা । এই উপাসনাকে তার *আই-বাম* (ai-bam) নামে অভিহিত করে থাকে। মৃত পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে খাবার ও প্রাণী উৎসর্গ করে থাকে। তারা এটা বিশ্বাস করে যে, পূর্বপুরুষের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা প্রত্যেক খাসিয়ার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কারণ এইসব আত্মার আশীর্বাদ না পেলে তাদের জীবনে সুখ-শান্তি থাকবে না এবং অসংখ্য অশুভ শক্তি দ্বারা তারা আক্রান্ত হবে। খাসিয়াদের আদিমাতা হচ্ছেন **কা-ইয়াঙবেই, এবং** আদিমাতার ভাই হচ্ছেন *উ-নি-র‍্যাংবাহ্*। সুদুর অতীতে তারা মৃত পূর্ব-পুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে বিরাটাকৃতির প্রস্তর খন্ড (লম্বা ও গোলাকৃতির) উত্তোলন করে বিভিন্ন স্থানে এক বিশেষ রীতিতে সাজিয়ে রাখত এবং গোলাকৃতির প্রস্তর খন্ডগুলোতে মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে খাবার উৎসর্গ করতো। কিন্তু বর্তমানে এই প্রস্তর উত্তোলন প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে খাবার নিবেদন অব্যাহত রয়েছে। এখনও তারা বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে মৃত পূর্ব-পুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে খাবার, ফলমূল ও প্রাণী উৎসর্গ করে থাকে তাদের আশীর্বাদ কামনায়।

শিশুর জন্ম পরবর্তী সময়ে করনীয় অনুষ্ঠানাদি ঃ যখন কোন খাসিয়া পরিবারে শিশুর জন্ম হয়, এর পূর্বেই প্রসূতি মাতার মহিলা আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রন দেয়া হয় এবং তারা এসময়কালে প্রসূতি মাতাকে সাহায্য করার জন্য তার বাড়ীতে চলে আসে । শিশু ভূমিষ্ট হলে তার নাভীরজ্জুটি (মাতার সাথে সংযুক্ত) একটি ধারালো বাঁশের সরু কঞ্চি দ্বারা কেটে শিশুর নাভীটি সূতা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয় । তারপর একটি মাটির পাত্রে পূর্বে করে রাখা গরম পানি দিয়ে শিশুটিকে পরিস্কার করা হয় । যদি শিশুটি পুত্রসন্তান হয় তবে তার পাশে একটি ধনুক (bow) এবং তিনটি তীর (arrow) রেখে দেয়া হয় । শিশুটি কন্যা হলে তার পাশে একটি দা (*কা-উয়েত)* এবং *উ-জার* (ঝুড়িতে বাঁধার ফিতা) রেখে দেয় হয় । প্রসুতি মাতার দেহ নির্গত গর্ভফুলটি (placenta) যত্নসহকারে একটি মাটির পাত্রে রেখে দেয়। প্রসূতি মাতার মহিলা আত্মীয়ারাই এসব কাজ করে থাকে। তারা কিছু চাল গুঁড়া করে (rice flour) করে একটি বাঁশের পাত্রে (*উ-প্রাহ -u-prah*) রেখে দেয়। একটি কলা পাতার মধ্যে তারা কিছুটা হলুদের গুঁড়া এবং পাঁচটি শুট্‌কী মাছ রেখে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর মহিলারারা নবজাতকের মঙ্গল কামনা করে পানির দেবতা (*কা-ব্লেই-স্যাম-উম* এবং *কা-নিয়াংগ্রিং*) এবং বন দেবতার (*উ-সুইদ-ব্রি* বা *উ-সুইদ-খ্লাউ*) এর উদ্দেশ্যে একটি ডিম ভেঙ্গে উৎসর্গ করে যাতে তারা নবজাতককে আশীর্বাদ করে। এরপর শিশুর পিতা গর্ভফুলসহ মাটির পাত্রটি নিয়ে বাড়ীর প্রধান দরজা দিয়ে বের হয়ে যায় এবং গ্রামের বাইরে কোন গাছে এই পাত্রটি ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে আসে। এই কাজ শেষ করে শিশুর পিতা ঘরে ফিরে এলে তার পা পানিতে ধোয়ানোর পর তাকে ঘরে ঢোকানো হয়। শিশুর পিতা ঘরে প্রবেশের পর তার এবং শিশুর মাতা ও শিশুর ডান পা চালের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া ও পানি দিয়ে ধোয়ানো হয়। যে সব আত্মীয় স্বজন সেখানে উপস্থিত থাকে তারা ঐ সকল দ্রব্যাদি দিয়ে তাদের বাঁ পা ধুয়ে ফেলে। শিশুর পিতা তারপর তিনবার অল্প পরিমান চালের গুঁড়া মুখে দেয়। তখন দুইজন আত্মীয় দুটি শুটকি মাছ দু'টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে। এরপর শিশুর পাশে রেখে দেয়া তীর, ধনুক অথবা দা এবং *উজার* এসব জিনিস যত্নসহকারে ঘরের ছাদের নিকটবর্তী দেয়ালে গেঁথে রাখা হয়। এভাবে খাসিয়ারা কোন শিশু জন্মপরবর্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে।

শিশুর নামকরণ ঃ শিশুর জন্মের পরদিন তার নাম রাখা হয়। এ পর্বে মূখ্য ভূমিকা পালন করে শিশুর মাতার বড়বোন। তিনি একটি ঝুঁড়িভর্তি মুরগীর ডিম ঘরের মাঝখানে রেখে দেন। এসময়ে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরাও উপস্থিত থাকে। ঝুঁড়ি থেকে একটি ডিম নিয়ে শিশুর মাতার বড় বোন সেটি ভেঙ্গে ফেলে। তার দুই কাঁধে দুটি কাঠি থাকে এবং সেগুলি সে এক বিশেষ কায়দায় মাটিতে ছুড়ে ফেলে এই মূহুর্তে সকলের কাছ থেকে একটি করে নাম আহবান করা হয়। নাম উচ্চারনের সাথে সাথে কাঠিগুলো যদি একটির উপর আরেকটি আড়াআড়ি ভাবে পড়ে তবে নামটি শিশুর জন্য নির্বাচিত হয়। নাম উচ্চারনের সাথে সাথে বাঞ্ছিত অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত একটি করে ডিম ভাঙ্গা এবং কাঠি ছুঁড়ে দেয়া চলতে থাকে। তবে অবস্থা দৃষ্টে ধারনা করা যায় যে, যিনি এই কাজ করেন কাঠি ছুঁড়ে ফেলার কৌশলটি তার জানা থাকে। কাজেই খুব দীর্ঘ সময় এভাবে ব্যয় করা হয় না এবং ডিমের অপচয় রোধ করাও সম্ভব হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382852

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে নাম রাখা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলে উপস্থিত সকলের মধ্যে চালের গুঁড়া এবং পুরুষদের মধ্যে মদ পরিবেশন করা হয় ।

শিশুর জন্মের তিনমাস পর তার কান ছিদ্র (bored) করে ইয়ারিং পরিয়ে দেয়া হয়। এই ইয়ারিং গুলোকে বলা হয় *কি-সাসকর-ইয়াওবেই* অর্থাৎ আদিমাতার কানের দুল ।

শবদাহ অনুষ্ঠান ঃ খাসিয়া সমাজে মৃত্যুর পর মৃতদেহ পোড়ানো হয় । এই শবদাহ অনুষ্ঠানটি নিম্নরুপ ঃ

খাসিয়া পরিবারে কারো মৃত্যু হলে সেই পরিবারের কোন সদস্য মৃতদেহের কানের কাছে তিনবার মৃতব্যক্তির নাম ধরে ডাক দেয় । কোনরুপ উত্তর না পেলে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত হয় যে ব্যক্তিটির মৃত্যু হয়েছে । অতপরঃ তিনটি মাটির পাত্রে রাখা গরম পানি দিয়ে মৃতদেহটি ধোয়ানো (bathed) হয় । এরপর মৃতদেহটি একটি পাটিতে (*জিমপুং*) রেখে সাদা কাপড়ে দেহটি ভালভাবে আবৃত করে দেয়া হয়। কাপড় পরানোর বিশেষ নিয়ম হলো সবসময় ডানদিক থেকে বাম দিকে পেঁচিয়ে বেঁধে দিতে হয় । অন্যভাবে নয় । নয়টি ভাত বা মুড়ি (*রিউ-হাডেন*) একটি সুতায় গেঁথে মৃতদেহের মাথায় বেঁধে দেয়া হয়। একটি ডিম মৃতদেহের পাকস্থলীর উপরে স্থাপন করা হয় । কোন ধনী খাসিয়া মহিলার মৃত্যু হলে, মৃতদেহে কানের দুল সহ নানা রকম গহনা পরিয়ে দেয়া হয় । এরপর একটি মোরগ মেরে প্রানী উৎসর্গ প্রথা খাসিয়ারা পালন করে । একটি পাত্রে খাবার ও সুপারি মৃতদেহের মাথার নিকট রেখে দেয়া হয় । অতঃপর মৃতদেহের পোড়ানোর স্থানে শবদেহটি নিয়ে যাওয়া হয় । কাঠ দ্বারা চিতা (pyre) সাজিয়ে আগুন দিয়ে চিতাটি প্রজ্বলিত করা হয় । এই মৃতদেহ সৎকার অনুষ্ঠানটি চলাকালে তারা *কা-শারাতি* নামক বাঁশি বাজিয়ে থাকে । মৃতদেহ পোড়ানো সম্পন্ন হলে চিতায় পানি ঢালা হয় । যে সব পোড়ানো অস্থি (bone) অবশিষ্ট থাকে সেগুলো মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজনরা একটি পরিস্কার সাদা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে আসে । এরপর একটি মাটির পাত্রে সেগুলো রেখে পাত্রের মুখটি সাদা কাপড়ে উত্তমরুপে বেঁধে তাদের পারিবারিক অস্থি সংরক্ষনাগারে (*মাউবাহ্*) রেখে দেয় । কোন খাসিয়ার মৃত্যু হলে তিন রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা হলো এই যে, উক্ত সময়ে তারা বাইরে কাজে যেতে পারে না । এই সময় অতিবাহিত হলে তারা পুনরায় পরিধেয়

Dhaka University Institutional Repository

বস্ত্র এবং ধৌত করা সম্ভব এমন সকল ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ধুয়ে কাজে বের হতে পারে। মৃত্যুর একমাস পর তারা পুনরায় একটি মোরগ মেরে মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি কামনায় উপাসনা করে থাকে। এই প্রানী উৎসর্গ অনুষ্ঠানটির নাম *আই-বাম লাইত-বনাই*।

এইরূপে খাসিয়ারা মৃতদেহের সৎকার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

হকতই ঃ সিলেট অঞ্চলের জৈন্তাপুর উপজেলার খাসিয়াদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন অনুষ্ঠানটির নাম হকতই। এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা এবং এইসব আত্মা যাতে জীবিতদের সুখ শান্তির জন্য আর্শীবাদ করে সেজন্য প্রার্থনা করা। বৎসরে দুইবার এই অনুষ্ঠান খাসিয়ারা উদ্‌যাপন করে থাকে। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে ঘরোয়া পরিবেশে সাধারনত ফলমূল মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এরপর মাঘ মাসে আবার এই অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করা হয়। গোষ্ঠীর সকলে মিলিতভাবে এই উৎসব পালন করে থাকে। তখন সমবেতভাবে বা একক ভাবে শুকর, মোরগ বা ছাগল পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিশেষ খাবার তৈরী করা হয়। পিঠা, মাংস এবং মিষ্টান্ন ইত্যাদি খাবারই এর মধ্যে প্রধান। এই উৎসবের আমেজ দুই তিন দিন ধরে চলে। এই দিনে সবাই তাদের আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রন করে থাকে এবং মিলিতভাবে উৎসব আকারে হকতই অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করে। উৎসবের দিন সন্ধ্যায় নাচ-গান মুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হকতই সহ খাসিয়াদের সকল অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ হলো নাচ, গান এবং মদ্যপান। তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় গান গেয়ে থাকে এবং নিজস্ব ভঙ্গীমায় নাচ পরিবেশন করে থাকে। নাচ-গান সম্বলিত অনুষ্ঠানাদিতে তারা বিশেষ পোষাক এবং অলংকার পরিধান করে থাকে। উৎসবের দিনগুলোতে খাসিয়া পুরুষেরা প্রচুর পরিমানে মদ (*খিয়েত*) পান করে থাকে।

আলোচিত ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান গুলোই বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠী উদ্‌যাপন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

বৃহত্তর বাঙ্গালী জনসাধারনের সাথে সম্পর্ক ঃ সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠী তাদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনেই স্বাচ্ছন্দবোধ করে থাকে । তারা বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই এই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে । এলাকার স্থানীয় জনসাধারনের (বাঙ্গালী) সাথে তাদের সম্পর্ক তাই আবহমান কালের । তবে খাসিয়ারা তাদের বাসস্থান এলাকাতে (পুঞ্জি) থাকতেই বেশী পছন্দ করে এবং একান্ত প্রয়োজনের সময়ই তারা পুঞ্জি ছেড়ে অন্যত্র গমনাগমন করে থাকে । খাসিয়ারা যেমন সহজ, সরল, প্রানদীপ্ত, সৎ এবং পরিশ্রমী তেমনি তারা স্বাতন্ত্রবোধ সম্পন্ন স্বাধীন চেতা নৃগোষ্ঠী ও বটে । তাদের সাথে যে সকল স্থানীয় বাঙ্গালীদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাদেরকে তারা সাদরে গ্রহন করে এবং উভয় পক্ষেই সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে একে অপরকে নিমন্ত্রন করে থাকে । এছাড়া ব্যবসায়িক (পানের ব্যবসা) কারনেও খাসিয়াদের সাথে অন্যান্যদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ।

জীবন যাপনের নানাবিধ প্রয়োজনে খাসিয়ারা বৃহত্তর বাঙ্গালী জনসাধারনের সাথে সম্পর্কিত । খাসিয়াদের সমতলের ধানের জমিগুলো স্থানীয় (বাঙ্গালী) বর্গাচাষীরা বর্গা নিয়ে থাকে । তাদের ঘরবাড়ি তৈরীর কাজেও অনেক সময় স্থানীয় (বাঙ্গালী) কারিগরেরা মজুরীর বিনিময়ে সাহায্য করে থাকে । খাসিয়ারা যে পান-সুপারি ও অন্যান্য ফসলাদি উৎপন্ন করে থাকে, সেগুলোর প্রধান ক্রেতা স্থানীয় বাঙ্গালী জনসাধারন । স্থানীয় বিদ্যালয় গুলোতে খাসিয়া শিশু - কিশোরেরা লেখাপড়া করছে । বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজ পরিচালিত নানাবিধ প্রতিষ্ঠান সমূহে খাসিয়ারা তাদের জন্য নতুন এমন কিছু পেশাতেও যোগ দিতে শুরু করেছে (যথাঃ শিক্ষকতা, হাসপাতালের আয়া, টেলিফোন অপারেটর ইত্যাদি) । আবার নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যসামগ্রী তারা স্থানীয় (বাঙ্গালী) বিক্রেতাদের নিকট

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ক্রয় করে থাকে । এভাবে এই দুটি সমাজই আবহমান কাল থেকে পরস্পর সুখ-দুঃখের সাথীরুপে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে । তারা সহজে এই চিরাচরিত সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চায় না । কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মাঝে মধ্যেই কিছু কিছু স্থানীয় (বাঙ্গালী) স্বার্থান্বেষী লোকজন দ্বারা তারা প্রতারিত হয়ে থাকে । তাই এ ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলো বৃহত্তর বাঙ্গালী ও খাসিয়া সমাজ উভয়ের সম্পর্কের মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে । এ ধরনের কিছু অবস্থা নিম্নরুপ ঃ

ক) কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল (বাঙ্গালী) খাসিয়াদের পানচাষের জন্য প্রয়োজনীয় বড় বড় গাছপালাগুলো অবাধে কেটে চলেছে । এ কারনে প্রায়ই তাদের সাথে বিরোধ দেখা দিচ্ছে ।

খ) অনেক সময় সবলমতি এবং অশিক্ষিত কোনো খাসিয়ার ঘরবাড়ি চক্রান্ত করে বিক্রির সুযোগও কেউ (বাঙ্গালী) নিতে চাইছে ।

গ) প্রয়োজনের সময় তারা বৃহত্তর বাঙ্গালী জনসাধারন এবং দেশের স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা ও তারা পায় না । যে কারনে এক ধরনের হতাশাবোধ তাদের মধ্যে কাজ করছে ।

ঘ) খাসিয়া তরুনীরা মাঝে-মধ্যেই এলাকার স্থানীয় (বাঙ্গালী) যুবকদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে । মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিয়ে কোনো কোনো যুবক (বাঙ্গালী) অনেক সময় তাদের প্রতারিত করার চেষ্টা করে থাকে । যেমন ঃ বিবাহের আশ্বাস দিয়ে প্রনয়ের সম্পর্ক স্থাপনের পর পরবর্তীতে বিবাহ না করা । বিভিন্ন ব্যবসায় টাকা পয়সা বাকীতে লেন-দেন করে পরবর্তীতে ফেরত না দেয়া ।

পর্যবেক্ষনে প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের অবস্থাগুলো খাসিয়া ও বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের সম্পর্কের মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টিতে সহায়ক এবং এসব কারনে খাসিয়ারা স্থানীয় বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজ থেকে আরও বেশী বিচ্ছিন্ন (isolated) হয়ে পড়ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিক পরিবর্তন ঃ সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠী যদিও তাদের প্রাচীন প্রথা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবর্তনে খুব একটা আগ্রহী নয় তথাপি দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালীদের সাথে পাশাপাশি বসবাস এবং মেলামেশার ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সামান্য হলেও তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে । পর্যবেক্ষনে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর যে অংশ বাঙ্গালী জনসাধারনের বসতির খুব কাছাকাছি বসবাস করছে (যথা ঃ জৈন্তাপুরের তোয়াশীহাটি ও উজানীনগর) তাদের জীবনধারায় এই পরিবর্তনের ছোঁয়া বেশ স্পষ্টরুপেই পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু বাঙ্গালী জনসাধারনের গ্রামগুলো থেকে একটু দূরে যেসব খাসিয়া গ্রামগুলো রয়েছে সেখানে পরিবর্তনের ছাপ এতটা স্পষ্ট নয় । (যথা ঃ মোকামপুঞ্জি, জাফলং এ অবস্থিত সংগ্রাম পুঞ্জি, নকশিয়া পুঞ্জি ইত্যাদি খাসিয়া অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে) এসকল দিক বিবেচনায় রেখে সার্বিকভাবে খাসিয়া সমাজ ও সংস্কৃতির সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো নিম্নরুপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

বাংলাদেশের খাসিয়া নৃগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে দারিদ্র গ্রস্থ । তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা পূর্বের তুলনায় বহুলভাবে হ্রাস পেয়েছে । এর কারণ হচ্ছে অধিকাংশই তাদের চিরাচরিত জুম পদ্ধতিতে পান চাষ করে থাকে । কিন্তু তাদের জুমের জন্য যেসব গাছ পালা প্রয়োজন স্থানীয় কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোকজন সেগুলো অবাধে কেটে চলেছে । শুধুমাত্র পান বিক্রি ছাড়া অধিকাংশ খাসিয়ারই আয়ের অন্য কোন পথ নেই । একারনে তারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । সমতলে আবাদযোগ্য যেসব জমি তাদের মালিকানায় রয়েছে সেগুলোও ধীরে ধীরে তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো স্থানীয় এলাকার কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোকজনের চক্রান্ত । আবার অধিকাংশ খাসিয়ারই নিজস্ব ভিটেবাড়ীটুকু ছাড়া অন্য কোন জমি নাই । এসব ভিটে বাড়িও অনেকে দখল করে নিতে চাইছে । এ সংক্রান্ত বিষয়ে তারা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক অবহেলিত হচ্ছে । এ প্রসংগে ৬ই পৌষ ১৪০৩ (বাংলা) তারিখের দৈনিক জনকন্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত 'জাফলং এর খাসিয়া

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের কথা ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে , " বল্লাপুঞ্জির জমিদার উইলিয়াম তংপেয়ার জানান, ১৯৬৫ সালে তাদের জমি জরিপ হয়েছিল । এর পর আর হয়নি । সেই অনুযায়ী খাজনা দিয়ে আসছে । অথচ ১৯৯৩/৯৪ অর্থ বছরে স্থানীয় তফসীল অফিস থেকে ১০টি পরিবারের জায়গা এনিমি (enemy property) হয়েছে । অভিযোগ উঠেছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক নয় অথচ ঐসব মানুষ খাজনা দিয়ে আসছে প্রতিবছর।" এসব কারনে দারিদ্র বেড়ে চলেছে এবং বাধ্য হয়েই তারা অন্যের (ধনী খাসিয়া) বাগানে পান চাষের জন্য কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং বিকল্প পেশা খুঁজে নিতে শুরু করেছে ।

পূর্বেকার ধর্মীয় বিধিনিষেধ গুলো খাসিয়া সমাজে অনেকাংশেই শিথিল হতে শুরু করেছে । তাদের ধর্মীয় আচারের প্রধান দিক বিভিন্ন প্রানী উৎসর্গ করার রীতি (নানোরকম শক্তির উদ্দেশ্যে) তারা আর পূর্বের মত পালন করতে পারছে না। বিশেষ করে ছাগল এবং শুকরের মূল্য বহুগুন বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব প্রানী এখন আর তারা হরহামেশা উৎসর্গ করতে পারে না । শুধুমাত্র ধনী খাসিয়ারা উৎসব বা পার্বনে এসব প্রানী উৎসর্গ করে থাকে । মোরগ উৎসর্গ করাই বর্তমানে বহুল পরিমানে বিভিন্ন উৎসবে তারা চালু রেখেছে ।

নানাবিধ অসুখের কারণ রুপে পূর্বে তারা যে বিভিন্ন প্রেতাত্মার প্রভাবে বিশ্বাস করত তাও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে । শিক্ষার প্রসারের ফলে এমনটি ঘটছে বলে প্রতীয়মান হয় । যে সকল (স্বল্প সংখ্যক) খাসিয়া, স্কুল শিক্ষক হিসাবে স্থানীয় এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত আছেন তারা এসব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং অন্যান্যদের মধ্যে সচেতনতা আনয়নের চেষ্টা করছেন । বর্তমানে তারা কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী জটিল অসুখে (যথাঃ ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড এবং অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যধি) পূর্বের মত *থামান* (স্থানীয় কবিরাজ) এর কাছে যাবার পবিরবর্তে স্থানীয় এলাকার গ্রামীন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসতে চেষ্টা করে । তবে স্বাস্থ্য কর্মসূচী (সরকারী বা

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী) এ এলাকায় অপ্রতুল বলে সব সময় তারা স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো পায় না । ছোট-খাট বা স্বল্প মেয়াদী অসুখগুলো (যথা ঃ সর্দি -কাশি, হাম, চর্মরোগ , ফোঁড়া ইত্যাদি) থেকে তারা তাদের নিজস্ব ভেষজ চিকিৎসার মাধ্যমেই আরোগ্য লাভের চেষ্টা করে ।

খাবার গ্রহনের ক্ষেত্রে তাদের অভ্যাসের বেশকিছু পরিবর্তন এসেছে । পূর্বে তারা যেকোন প্রানীই (সুবিধামত পাওয়া যায় এমন। যথা ঃ ইঁদুর , ব্যঙ, শামুক) খাবার হিসাবে গ্রহন করত । বর্তমানে এ অভ্যাসের পরিবর্তন এসেছে । এসব প্রানী তারা আর খায় না । ভাত, মাছ, ডাল, আলু ও অন্যান্য শাকসব্জি এবং মাংস বর্তমানে তাদের প্রধান খাদ্য । তবে পাখি শিকার খাসিয়া কিশোর কিশোরীদের প্রিয় শখ । সুযোগ পেলেই তারা অবসর সময়ে ঘুঘু, টিয়া, বনমোরগ ইত্যাদি পাখি শিকার করে এবং এর মাংস পুড়িয়ে খেয়ে থাকে ।

পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ক্ষেত্রে খাসিয়া সমাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে । বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে । খাসিয়া পুরুষেরা এখন আর তাদের প্রাচীন ধরনের পোষাক (কোমরে সামান্য বস্ত্রখন্ড এবং হাতাকাটা জামা) পরিধান করেনা । তারা বাঙ্গালীদের মতই লুঙ্গি, পেন্ট, গেঞ্জী এবং শার্ট ব্যবহার করে । মহিলাদের ক্ষেত্রে দুই ধরনের পোশাক পরিধান করতে দেখা যায় । যেসব খাসিয়া মহিলা প্রাচীন খাসিয়া ধর্মে অবস্থান করছে তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পোশাক (*কা-জৈন-ছেম)* ব্যবহার করে থাকে । যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহন করেছে অথবা হিন্দু যুবকের সাথে বিবাহের সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে তাদেরকে বাঙ্গালী রমনীদের মত ব্লাউজ , পেটিকোটসহ শাড়ী পরিধান করতে দেখা যায় । খ্রীষ্টান খাসিয়া মহিলারা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক *কা-জৈন-ছেম* ব্যবহার করে এবং অনেকে স্কার্ট , ব্লাউজ ইত্যাদি পোশাকও পরিধান করে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। অন্য ধর্মে বিশেষ করে হিন্দু এবং মুসলমানদের সাথে পরিনয়ের ঘটনা বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। (কিন্তু এধরনের বিবাহ হলেও খাসিয়া রমনীরা সাধারনত বসবাস করার জন্য স্বামীর গৃহে যায় না বরং স্বামীরাই তাদের গৃহে বসবাসের জন্য চলে আসতে দেখা যায়)। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পিতা-মাতা এবং অভিভাবকের সমঝোতার চেয়ে প্রেমঘটিত বিবাহই বর্তমানে বেশী হচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। সুদূর অতীতে ধর্মীয় কারনে তারা লেখা পড়া করতো না। কিন্তু দীর্ঘদিন বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের সাথে পাশাপাশি বসবাস ও মেলামেশার ফলে এবং মিশনারীরা তাদের মধ্যে কাজ করার ফলে তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় যে, অধিকাংশ খাসিয়া শিশু কিশোরেরা প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষা লাভ করে থাকে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, খাসিয়াদের নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও এভাষার কোন বর্ণমালা নেই। বর্তমানে ইংরেজী বর্ণমালা ব্যবহার করে তারা এভাষার লিখিত রুপ দেয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানে বাংলা এবং ইংরেজীই তাদের শিক্ষার মাধ্যম।

পূর্বে খাসিয়ারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ ছিল। যার ফলশ্রুতিতে অতীতে এ অঞ্চলে তাদের একটি ক্ষুদ্র রাজত্বও তারা গড়ে তুলতে পেরেছিল। তাদের এই রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতার কারনে ১৮৩৫ (ইং) সন পর্যন্ত বৃটিশ শাসকেরা এ অঞ্চলে তাদের শাসন কায়েম করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু ১৮৩৫ সনে বৃটিশ কর্তৃক খাসিয়া রাজত্বের অবসানের পর তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা *পুঞ্জি* ভিত্তিক (গ্রাম ভিত্তিক) হয়ে পড়ে এবং এই সংগঠন ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে। সাম্প্রতিক সময়ে খাসিয়া গ্রামগুলোতে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যে কারনে তারা নানাধরনের প্রতিকুল অবস্থায় দিনাতিপাত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বস্তুগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী লোকবসতির খুব কাছাকাছি খাসিয়া ঘরবাড়ীগুলো বাঙ্গালী ধাঁচেই তারা নির্মান করেছে এবং আসবাব পত্রাদিও বাঙ্গালীদের অনুকরনে তৈরী করেছে ।

খাসিয়ারা মদ্যপানে অভ্যস্ত । বিশেষ করে খাসিয়া পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান বহুল প্রচলিত ছিল । তবে সাম্প্রতিক সময়ে খাসিয়া পুরুষদের মদ্যপানে আসক্তি কমে আসছে বলে প্রতীয়মান হয় । বিশেষ করে যে সব খাসিয়া পুরুষেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছে তাদের মধ্যে মদ্যপানের আসক্তি খুব কম ।

খাসিয়াদের গতানুগতিক চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় এসব সাম্প্রতিক পরিবর্তন সূচিত হবার কারণ গুলো নিম্নরুপ ঃ

(ক) **বৃহত্তর জনসাধারনের সাথে মেলামিশা ঃ** বৃহত্তর জনসাধারনের (বাঙ্গালী) সাথে দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস এবং মেলামেশা এই পরিবর্তনগুলোর অন্যতম কারণ।

(খ) **ব্যবসায়িক কারণ ঃ** সিলেট জেলার খাসিয়াদের মূল পেশা হচ্ছে পান চাষ এবং পানের ব্যবসা। ব্যবসায়িক লেনদেনের কারনে তারা বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত হয়েছে এবং এর প্রভাব তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পড়েছে ।

(গ) **শিক্ষার প্রসার ঃ** পূর্বের তুলনায় খাসিয়াদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহনের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে । যার ফলে তাদের অনেকেই পানের ব্যবসার পাশাপাশি আয়ের বিকল্প পথ খুঁজে নিতে চাইছে । ইতিমধ্যেই অনেকে শিক্ষকতা, টেলিফোন অপারেটর, হাসপাতালের আয়া , বিদ্যুৎ অফিসের কর্মচারী ইত্যাদি পেশাতে যোগ

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে । শিক্ষার প্রসারের ফলে তাদের ধর্মীয় সংস্কার বিশেষ করে রোগ-ব্যধি সংক্রান্ত প্রাচীন সংস্কারগুলো দূরীভূত হতে শুরু করেছে ।

তবে সাম্প্রতিক এসব পরিবর্তন সমূহ তাদের জীবনে এলেও তারা তাদের গোষ্ঠীগত স্বকিয়তা হারাতে চায় না । তারা নিরীহ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে বিশ্বাস করে । তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ তাদের ক্ষতি করুক এটাও তারা চায় না । একটি বিরল সংস্কৃতির ধারক হিসাবে বাংলাদেশের অন্যান্য নাগরিকদের মত তারাও সকল সুযোগ সুবিধা সমভাবে ভোগ করার আশা পোষন করে । তাই বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন এন. জি. ও. তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলে সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মেধা ও পরিশ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন হবে বলে আশা করা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

Glossary (শব্দকোষ)

স্থানীয় শব্দ		বাংলা অর্থ
আই-বাম	-	মৃত পূর্ব পুরুষের আত্মার উপাসনা
আই-বাম-লাইত-বনাই	-	কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে প্রানী উৎসর্গের অনুষ্ঠান।
ইয়ুং মনডুর	-	বসার ঘর
ইয়ুং ছেটজা	-	রান্না ঘর
ইকর	-	বাঁশ জাতীয় উদ্ভিদ
ইয়ুং পথি	-	পান রোপনের স্থান
উ-লেই-মুলক	-	খাসিয়াদের দেবতা
উ-ব্লাই-নং থাউ	-	খাসিয়াদের ঈশ্বর
উ-খারা	-	ছেলেদের ব্যবহার্য ঝুড়ি
উ-খোয়াই	-	বরশি
উ-হাম/ফ্রুট	-	তীর
উতার	-	পান বহনের ঝুড়ির ফিতা
উ-আইত	-	দা
উস-ডাই	-	কুঠার
উক সিয়াং	-	বিয়ের পুরোহিত
উ-ইচ-ডাই	-	কুঠার
উ-নগাপ	-	মৌমাছির চাক
উ-লেই-আমতং	-	পানির দেবতা
উ-লেই-লংমপহ	-	ধন সম্পদের দেবতা
উ-রিং-খেউ বা উ-বাসা	-	গ্রাম দেবতা

Dhaka University Institutional Repository

উ-নি-র‍্যাংবাহ্	–	আদি মাতার ভ্রাতা
উ-গ্রাহ	–	বাঁশের পাত্র
উ-সুইদ-ব্রি/উ-সুইদ-খ্লাউ	–	বন দেবতা
কা-তারো	–	খাসিয়াদের উপাস্য এক বিশেষ শক্তি
কা-জেইন-ছেম	–	খাসিয়া মহিলাদের পোশাক
কে-পেইন	–	গলার হার
কা-শারাতি	–	বাঁশী
কা-দুইতারা	–	গীটার
কা-মরিনাস	–	ভায়োলিন
কা-নাকড়া	–	ঢোল
কা-প্লিয়াং/ডিংকুই	–	থালা
কা-ছিয়াং	–	বড় চামচ
কুম	–	কলসী
কা-খ	–	মেয়েদের ব্যবহার্য ঝুড়ি
কা-পালাইন	–	মাছ ধরার জাল
কা-রিনতেই	–	ধনুক
কা-খাড়ু	–	কনিষ্ঠা কন্যা
কা-ইয়ুং সেং	–	কনিষ্ঠা কন্যার বসতবাটি
কুর	–	গোত্র
কুয়াই/কুই	–	সুপারী
কা-উয়েত-লিংগাম	–	একটি বড় দা
কা-ইয়ুং - মই	–	মই
কা-ছিরিউ	–	কচু
কা-ইয়াওবেই	–	আদি মাতা

Dhaka University Institutional Repository

কা-রিহ	-	ম্যালেরিয়াজ্বরের কারণ
কা-খ্লাম	-	কলেরা রোগের কারণ
কা-ডুবা	-	অতি প্রাকৃত শক্তি
কা-ব্লেই-স্যাম-উম	-	পানির দেবতা
কা-নিয়াংগ্রিং	-	অতি প্রাকৃত শক্তি
কি-স্যাসকর-ইয়াওবেই	-	আদি মাতার কানের দুল
খোল	-	সুপারী পাতার নিচের শক্ত অংশ
খিয়েত	-	মদ
খি-বাগান	-	পারিবারিক বাগান
খা-ইলা	-	কানের দুল
খু-ড়ু	-	চুড়ি
খা-ইয়াং	-	এক প্রকার গাছের শিকড়
খুরি	-	চুলা
চংইসমেন	-	আগুনে ফুদেবার বাঁশের ফাঁপা দন্ড
চং কুয়াই/খ্লাই-কুই	-	সুপারী রাখার পাত্র
ছে-ঝোর	-	খুন্তি
ছিয়াং চা	-	চা-চামচ
ছিল্লেয়	-	মাদুর
ছ-লাহ্	-	আলু
জুম	-	পাহাড়ী এলাকার বিশেষ ধরনের চাষ পদ্ধতি
জা-ড	-	মাংস ও চাল দিয়ে একটি বিশেষ রান্না
জিপুট-ছ	-	গীটার
জেং কেইন/কা-ইউ-মই	-	মই
জিমপুং	-	পাটি

Dhaka University Institutional Repository

তসলা	–	হাঁড়ি
তর-উয়াং	–	কড়াই
থেলেন	–	অজগর সাপ
থাবা	–	পান বহনের ঝুড়ি
থাউ থিয়ে	–	শয়ন কক্ষ
থাভ-ছেন	–	খাসিয়া মহিলাদের পোশাক
থামান	–	কবিরাজ বা ওঝা
ধারি-প্রাং	–	বাড়ির সামনের বারান্দা
ধারি-রেন	–	বাড়ির পিছনের বারান্দা
ধারি	–	বারান্দা
নতিংয়াং পুঞ্জি	–	একটি বিশেষ খাসিয়া গ্রাম
পুঞ্জি	–	খাসিয়া গ্রাম
পনার	–	গোত্রের নাম
পারডিপ	–	প্রদীপ
ফা-ছিলই	–	বন্দুক
ভে-দিং-খ্লাম	–	একটি খাসিয়া উৎসব
মন-খেমার	–	খাসিয়া ভাষাগোষ্ঠীর নাম
মন্ত্রী	–	দলপতি বা নেতা
মটকা	–	মাটির পাত্র
মউ-খিউ-হে	–	বড় আকৃতির নিড়ানি
মাউবাহ্	–	মৃতদেহের সৎকারকৃত অস্থিরাখার স্থান
লা-তরপাদ/তেজ পাট	–	তেজপাতা
ল্যানটেন	–	হারিকেন
বা-খু	–	কোদাল

Dhaka University Institutional Repository

বলী	–	দেবতার উদ্দেশ্যে প্রানী বধ করা
বাতুর-ছ্যায়	–	ছোট ছেলেদের পাখী মারার যন্ত্র
সিয়েম	–	খাসিয়া রাজা
সর্দার	–	দলপতি
সিন্‌তেং	–	গোত্রের নাম
সরতা	–	সুপারী কাটার যন্ত্র
হকতই	–	খাসিয়াদের বিশেষ উৎসব
রিউ-হাডেন	–	মুড়ি
রাজা	–	শাসনকর্তা
রি-ইসমেন	–	দিয়াশলাই

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি ও গ্রন্থ নির্দেশিকা

Ahsan Selina
1993
The Marmas of Bangladesh
(H.R.D.P. Winorck International)

Bahadur K. P.
1977
Caste Tribe and Culture of India
(ESS ESS Publication Delhi)

Barkataki S.(Compiled by)
1969
Tribes of Assam. P. 29
(National Book Trust, New Delhi, India)

Chakraborti M.
and
D. Mukherji
1971
Indian Tribes
(Calcutta : Saraswati Library)

Chatterji S.K.
1970
Origin and Development of the Bengali Language.
Reprint (Original 1926). London

Chattapdhyay K.P.
1994
Eassys in Social Anthropology. P.159
(K.P. Bagchi & Company, Calcutta)

চৌধুরী আনোয়ার-উল্লাহ
এবং
সাইফুর রশীদ
১৯৯৫
নৃবিজ্ঞান ঃ উদ্ভব বিকাশ ও গবেষনা পদ্ধতি । পৃঃ-১৬২
(বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ)

Chowdhury J.N.
1996
Khasi People. PP. 65-66
(Published By The Author, Quinton Road Shilong, Meghalaya, India)

Dhaka University Institutional Repository

Crooke W. 1907 — The Native Races of the British Empire: Northern India. (London, Archibald Constable and Company Ltd)

Dalton E.T. 1882 — Descriptive Ethnology of Bengal (Indian Studies, Calcutta)

Dalton E.T. 1978 — Tribal History of Eastern India (Cosmo Publication, New Delhi, India)

Das S.T. 1986 — Tribal Life of North Eastern India P. 45 (Gian Publishing House, Delhi-110007, India)

Evans-Pritchard E.E. 1951 — Kinship and Marriage Among the Nuer (Oxford at the Clarendon Press)

Fuch Stephen 1973 — The Aboriginal Tribes of India (Macmillan, India)

Gait E.A. 1906 — History of Assam (Calcutta, India)

Grierson G.A. 1916 — The Linguistic Survey of India, Vol II (Calcutta, government of India)

Grierson G.A. 1903 — Bengali and Assamese, Vol V. Part II: Linguistic Survey of India (Calcutta, India)

Guha B.S. 1931 — Census of India Ethnographical (Vol, 1. Part III : Culcutta)

Dhaka University Institutional Repository

Gurdon P.R.T. 1907 — The Khasis. PP. 1-2, 66 (Cosmo Publication, Delhi, India)

Harries Marvin 1975 — Cultural People Nature (New York, Thomes Y, Crowell Company)

Herskovits Melville J. 1955 — Cultural Anthropology (Oxford & IBH Publishing Co.)

Herskovits Melville J. 1940 — The Economic Life of Primitive People (New York : Knopf)

Hodson T.C. 1908 — The Meitheis (London, DAVID NATT, 57, 59, LONG ACRE)

Hodson T.C. 1911 — The Naga Tribes of Monipur (MACMILLAN & CO.LTD, St Martin's St. London)

Hoebel E.A. 1974 — The Law of Primitive Man (New York: Atheneum- Orig.1954)

Hunter W.W. 1976 — A Statistical Account of Bengal Vol VI (D.K. Publishing House, Delhi)

ইসলাম এ.কে. আমিনুল ১৯৮৯ — এই পৃথিবীর মানুষ - ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬৮, ১৬৯। (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

Lowie H.R. 1951 — Primitive Society (Routledge & Kegan and Paul Ltd. Broadway House, 68-74, Carter Lane, E.C.4)

Dhaka University Institutional Repository

Louie Figuier
1870
Primitive Man
(London, Chapman and Hall, 193 Piccadilly)

Lyall C.J.
1908
Mikirs
(London)

Malinowski Bronislaw
1922
Argonauts of the Western Pacific
(London: Routledge and Kegan Paul)

Marshal William.E.
1873
Todas in South India
(London : Longmand Green & Co)

Morgan Lewis Henry
1977
Ancient Society
(New York, Holt, Penehart)

Plafair A.
1909
The Garos
(London,DAVID NATT,57.59 LONG ACRE)

Risley H,
1887
People of India
(Calcutta)

Risley H.
1891
The Caste and Tribes of Bengal
(Calcutta)

Rizvi S.N.A.(Edited by)
1970
East Pakistan District Gazetteers, Sylhet. PP. 45-46,51
(East Pakistan Govt Press, Dacca)

Roy S. C.
1915
The Oraons of Chota Nagpur
(The Brahmo Mission Press, 211 Cornwallis St Calcutta)

Dhaka University Institutional Repository

Sattar Abdus
1975
Trible Culture in Bangladesh
(Muktadhara, Dhaka)

Schmidt Max
1926
The Primitive Races of Mankind
(George G. Harrap & Co Ltd, London)

Seligmann C.G.
and
Seligmann Brenda Z.
1911
The Veddas
(Cambridge : at the University Press)

Singh Ajit K.
1982
Tribal Festivals of Bihar
(Concept Publishing Company, New Delhi)

Sinha Kamaleshwar
1970
Meghalaya: Triump of the Tribal Genius PP.16, 54-55
(Publication Division I.S.S.D)

Shakespear J.
1912
The Lushei Kuki Clans
(Macmillan and Co. Ltd. St Martin's St. London)

সিংহ অনিল কিষন
১৯৯৪
সিলেটের মনিপুরী সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতি সত্তা। পৃঃ১৭০
(জেলা পরিক্রমা, সিলেট)

সেন সুকুমার
১৯৯৪
ভাষার ইতিবৃত্ত ঃ পৃঃ ১৩৭ -১৩৮ ।
(আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -৯)

Vidyarthi L.P.
1977
The Tribal Culture of India
(Concept Publishing Company, Delhi)

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া পুন্জির প্রবেশ পথ

একটি অবস্থাপন্ন খাসিয়া বাড়ী

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ীর বারান্দায় পান-সুপারি সংগ্রহের ঝুড়ি ঝুলিয়ে রাখা

পাহাড়ের ঢালে পানের বাগান

Dhaka University Institutional Repository

বিক্রির জন্য পান গুছিয়ে রাখা

বাজারে পান বিক্রয়রত খাসিয়া মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

সুপারি সংগ্রহের পর সেগুলো বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা

সুপারি বিক্রয়ের প্রস্তুতি

Dhaka University Institutional Repository

পান গোছানোর কাজে ব্যস্ত বাসিয়া রমণী

পান বিক্রি শেষে রাতে ঘরে ফেরা

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়াদের ব্যবহৃত তৈজষপত্রাদি

সাজিয়ে রাখা তৈজষপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

গৃহস্থলীর কাজে কর্মরত খাসিয়া শিশু

রন্ধনরত খাসিয়া পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

খাসিয়া শিশু

মোকামপুঞ্জি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

খেলাধুলারত খাসিয়া শিশু

অবসর মুহূর্ত

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিক কালে নির্মিত উপাসনালয়ের পাশে প্রতিষ্ঠার্থী খাসিয়া মহিলা

অবস্থাপন্ন খাসিয়া মহিলা (সাবেক মন্ত্রী পরিবারের সদস্যা)

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র বৃক্ষরাজি

গৃহপালিত পশু

Dhaka University Institutional Repository

অতি প্রাচীন প্রস্তরখন্ড

বিশাল শিলাখন্ড